ই-জার্নাল প্রজেক্ট

শৈলী

আড্ডা হোক শুদ্ধতায়

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মজয়ন্তীতে শৈলীর নিবেদন

মে ২০১১

“রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মজয়ন্তীতে শৈলীর নিবেদন”

কিশোর রবীন্দ্রনাথ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কেচ অবলম্বনে গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

তোমার স্নেহের কোলে
আমার স্নেহের ধন
করিনু অর্পণ।
বিমল প্রশান্ত মুখে
ফুটিবে স্নেহের হাসি
দেখিবারে আশা হে.....

-- রবীঠাকুর

http://shoily.com

তুমি যে তুমিই ওগো সেই তব ঋণ....

.....রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!

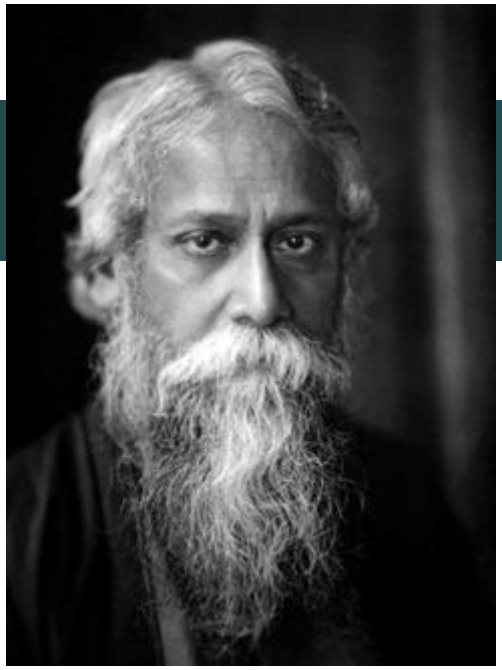

শৈলী

ই জার্নাল প্রজেক্ট

শৈলী.কম -এর প্রয়াস,
এপ্রিল ২০১১

ক থা শৈ লী

অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে একসময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে। প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউ-ঠাকুরানীর হাট গল্পে- একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজও হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি, সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়ে নি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা-তা কাণ্ড করত বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।

সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে- এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।

এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে একসময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে-সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী-কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে-সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।

--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির হস্তাক্ষরে কবিতা, হাঙ্গেরিতে লিখিত, ১৯২৬: বাংলা ও ইংরেজিতে

লেখন ১

স্বপ্ন আমার জোনাকি
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর ধ্বনিকা॥

My fancies are fireflies
speaks of living light—
twinkling in the dark.

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে॥

The same voice murmurs
in these desultory lines
which is born in wayside fancies
letting hasty glances pass by.

প্রজাপতি মোরে ধরে না গণে;
নিমেষ গণিয়া বাঁচে,
সময় তাহার যথেষ্ট তাই আছে॥

The butterfly does not count years
but moments
and therefore has enough time.

শৈলী

ই জার্নাল প্রজেক্ট

শৈলী.কম -এর প্রয়াস,
মে,২০১১

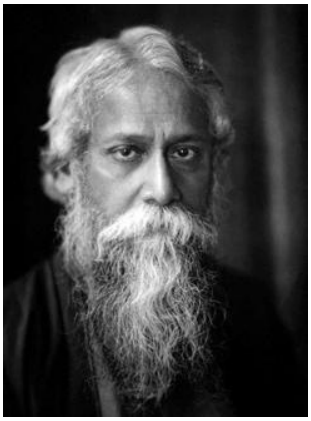

ভূ মি কা

কবিগুরুর সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ শৈলী নিবেদন করল এই শ্রদ্ধাঞ্জলটিকু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি সংস্কৃতির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তাঁর মধ্যেই প্রকাশ ঘটেছে একই সঙ্গে বাঙালির সৌন্দর্যবোধ ও মননশীলতার উপাদানসমূহ, সর্বাধিক পরিমাণে। বাংলা সাহিত্যের তিনি সর্বকালের সবচেয়ে বড় প্রতিভা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান প্রভৃতি শুধু নয়; সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই, যা তিনি স্পর্শ করেননি। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিকেই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অনতিক্রম্য। বাংলা সাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনিই এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। শুধু শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা বিরাট। এবং তাঁর গঠনমূলক ও সাংগঠনিক কাজের পরিমাণও বিশাল। যে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তা তাঁকে একজন মহান কর্মযোগীর মর্যাদায় ভূষিত করেছে। আজ পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী।

কবিগুরুর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শৈলী আজ ১৫০ পাতার পিডিএফটি প্রকাশ করল।

আপনাদের এতটুকু ভালো লাগলেই আমাদের উদ্যাগ স্বার্থক।

ভালো থাকুন !

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
রিপন কুমার দে

প্রচ্ছদ
শৈলী টিম
অনলাইন থেকে সংগ্রহকৃত

তত্ত্বাবধান
এবং অলংকরন
শৈলী ই-বুক টিম

প্রকাশক
শৈলী প্রকাশনা, শৈলী.কম
©shoily.com

কিছু কথা.....

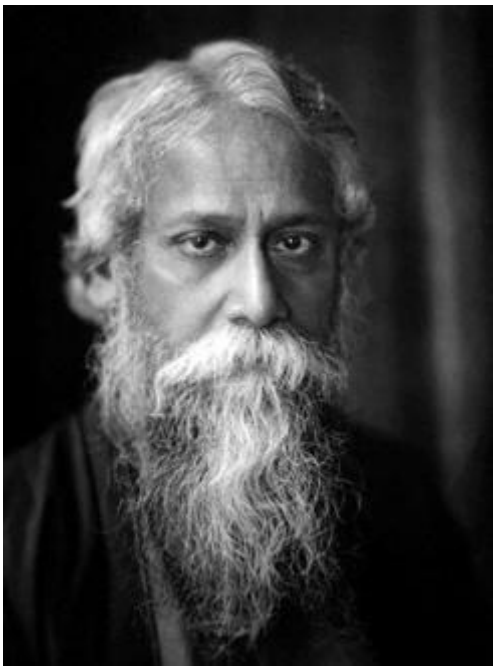

রবীঠাকুর নানান রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস, ছোটোগল্প, সংগীত, নৃত্যনাট্য, পত্রসাহিত্য ও প্রবন্ধসমূহ। বঙ্গীয় শিল্পের আধুনিকীকরণে তিনি ধ্রুপদি ভারতীয় রূপকল্পের দূরুহতা ও কঠোরতাকে বর্জন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁর মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বিচিত্র ও বিপুল সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথ এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন এ বিশ্বকবি!

“রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মজয়ন্তীতে শৈলীর নিবেদন”

শুরু.....

রবীন্দ্র-পরিচয়

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার স্মৃতিচারণা করেছেন এই *রবীন্দ্র-পরিচয়* নিবন্ধে। এটি ১৯৪১ সালে কবিগুরুর আশিতম জন্মদিনে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* পত্রিকার বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল। শৈলীতে লেখকের পুরনো বানান অবিকৃত রাখা হল

আমি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম রবীন্দ্রনাথের দর্শন লাভ করি। কলকাতায় নয়, কৃষ্ণনগরে ; কোনো সভাসমিতিতে নয় – আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রা করেন, তখন আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত জাহাজে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী মাদ্রাজ থেকেই ফিরে আসেন; - দাদা অবশ্য বিলেত পর্যন্ত পাড়ি দেন। এই দুচারদিনেই দাদা ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। দাদা উক্ত সনের ৩রা মার্চ তারিখে ফিরে আসেন। এ তারিখ আমার মনে আছে – কেননা ঐ তারিখেই আমি একটি ভয়ঙ্কর পীড়াদায়ক রোগে আক্রান্ত হই। এবং প্রায় মাসখানেক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে বেঁচে উঠি।

রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বোধহয় দাদার সঙ্গে তাঁর ভাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সম্বন্ধ করবার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। আমার বয়েস তখন আঠারো, আর রবীন্দ্রনাথের বয়েস পঁচিশ। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের নাম অবশ্য শুনেছিলুম, কিন্তু তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না।

আমার বয়েস যখন আট, তখন নাবালক-রবীন্দ্রনাথ সেকালের কোনও একটি মাসিক পত্রিকায় দুটি একটি কবিতা প্রকাশ করতেন। দাদা ও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা সেই সব কবিতার বিষয় আলোচনা করতেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথের লেখা কোনকালেই উপেক্ষিত হয়নি, - আর তাঁর কবিতা যে মামুলি নয়, তাও অনেকের চোখে পড়েছিল।
তারপর তেরো বৎসর বয়েস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যই আমার হাতে পড়েনি।
তেরো বৎসর বয়েসে আমি ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্যে কৃষ্ণনগর থেকে পালিয়ে পশ্চিমে যাই ; আর সাড়ে তেরো বৎসর বয়েসে কলকাতায় পড়তে আসি ও হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হই। এই সময় কোনও sentimental সহপাঠীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' পড়ি। সে বই আমার মনের উপর কোন ছাপ রেখে যায়নি। তারপর সাড়ে ষোলো বছর বয়েসে আমরা কৃষ্ণনগরে ফিরে যাই এবং সেখানেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি। এ সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়ে আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হইনি। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাঁর কাব্য পড়ি। অর্থাৎ আমি কোনও রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখিনি - দেখেছিলুম সাদা চোখে। আর তখন আমার চোখ কান দু-ই খোলা ছিল।
আমি এর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ কখনো দেখিনি। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, আকৃতি দীর্ঘ, কেশ আপৃষ্ঠ-লম্বিত ও কৃষ্ণবর্ণ, দেহ বলিষ্ঠ, চর্ম মসৃণ ও চিক্কণ, চোখ-নাক অতি সুন্দর।
আমাদের সমাজে গৌরবর্ণ স্ত্রী-পুরুষ একান্ত বিরল নয়, বিশেষত আমাদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে। কিন্তু সে বর্ণ প্রায়ই "কটা"। লম্বা লোকও দুচারজন দেখেছি, কিন্তু তাঁদের দেহ সুগঠিত নয়, পদে পদে তাঁদের দেহের ছন্দপতন হয়। সুন্দর মুখও দেখেছি, কিন্তু সে সব মুখ যেন প্রক্ষিপ্ত, দেহ থেকে উদ্ভূত নয়। রবীন্দ্রনাথ সেকালে গায়ে জামা দিতেন না। পরতেন একখানি ধুতি আর গায়ে দিতেন একখানি চাদর। সুতরাং তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দেখবার আমার সুযোগ হয়েছিল ; উপরন্তু তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ছিল প্রাণে ভরপুর, প্রাণ তাঁর দেহ ও মুখে টগ্‌বগ্‌ করত। তিনি ছিলেন একটি জীবন্ত ছবি। রূপের যদি প্রসাদগুণ থাকে ত সে গুণ তাঁর দেহে ছিল।
এই সময়ে আমি তাঁর গানও শুনেছি। কণ্ঠস্বরের এতাদৃশ ঐশ্বর্য আমি পূর্ব্বে কখনও শুনিনি। বিলেতি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দুটি যন্ত্র আমাকে মুগ্ধ করত। একটি cornet, অপরটি 'cello ; তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল cornetজাতীয়, 'celloজাতীয় নয়। প্রাণের উচ্ছ্বাস এ কণ্ঠস্বরের বিশেষত্ব ছিল। তিনি একটি হিন্দি গান গেয়েছিলেন, যা আমার আজও মনে আছে।

তার প্রথম কথাগুলি "জন ছুঁয়া মোরি বঁইয়া নাগরওয়া"। এ গানটির সুর বোধহয় তোড়ী, নয়ত সেই ঘরের। এ রাগে গলা খোলবার ও তোলবার যথেষ্ট অবসর আছে। আর তাঁর সুর তারার পঞ্চম পর্যন্ত অবলীলাক্রমে উঠে যেত। কিন্তু সে-সময়ে লক্ষ্য করি যে, তিনি তানের পক্ষপাতী ছিলেন না। খেয়ালের বে-পরোয়া তানের ও টপ্পার অবিশ্রান্ত কম্পনের সাধনা তিনি করেননি। সঙ্গীতের এ দুই কাজ বাঙ্গালীদের কোনকালেই শ্রোত্র-রসায়ন নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কানে এ জাতীয় টপ্পাখেয়াল শ্রুতিকটু। সুর যখন কথার সঙ্গে সন্ধিবিচ্ছেদ করে' যন্ত্র-সঙ্গীতের বৃথা নকল করে, কবির কানে তা গ্রাহ্য হয় না। আমি বুঝলুম যে, ধ্রুপদ অঙ্গের গানেই তাঁর কান অভ্যস্ত। রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত গানের বিশেষত্বও এই। তাঁর অন্তরের অদম্য প্রাণশক্তি সঙ্গীতশাস্ত্রের বিধিনিষেধ অতিক্রম করতে বাধ্য, এ প্রবন্ধে অবশ্য আমি তাঁর গানের আলোচনা করব না। মোদ্দা কথা এই যে, তাঁর রূপ দেখে ও কণ্ঠস্বর শুনে আমি প্রথম থেকেই তাঁকে একজন লোকোত্তর পুরুষ বলে চিনতে পারি। যখন আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি, তখন তিনি আমাকে দেখেন নি। এর কারণ রোগশয্যায় আমার মস্তক মুণ্ডন করা হয়েছিল, তাই আমি লোকসমাজে দেখা দিতুম না।

সে যাই হোক্, আমি পাশের ঘর থেকে তাঁর ও তাঁর সহচরদের কথাবার্ত্তা শুনতুম। তাঁর কথোপকথন আমাকে মুগ্ধ করত। তাঁর রসিকতার চুম্‌কি-বসানো কথাবার্ত্তা ও তাঁর মনের স্ফূর্ত্তি আমাকে অবাক করত। আমি আসলে বাঙ্গাল হলেও, হয়ে উঠছিলুম কৃষ্ণনাগরিক। আর সেকালে কৃষ্ণনাগরিকদের, বিশেষতঃ নিষ্কর্মা বারেন্দ্র দলের আর কোনো গুণ না থাক্, তাঁরা বাক্-চাতুরীর চর্চ্চা করতেন এবং রসিকতা যে বাক্যের একটা মহাগুণ, তা আমি জানতুম। তাই রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন যে যেমন মনোহারী তেমনি উজ্জ্বল, তা আমি হৃদয়ঙ্গম করি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য যে রসিকতায় চমকপ্রদ, তা আশা কর সকলেই জানেন। এ গুণ কবিত্বশক্তির মতোই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। বড় কবিও যে অসাধারণ witty হতে পারেন, ইনিই তার প্রমাণ।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে আমি দূর থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখি, আর পাশের ঘর থেকে তাঁর কথাবার্ত্তা শুনি। রবীন্দ্রনাথের দুজন সঙ্গী ছিল, - তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রমণীমোহন ছিলেন দাদার কৈশোরের সহপাঠী আর তাঁর আকৈশোর বন্ধু। উপরন্তু তিনি ছিলেন M.A. পাশ আর অতি বুদ্ধিমান লোক। দাদা, রবীন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ ও রমণীমোহন – আমার যতদূর মনে পড়ে, এঁরা চারজনে হাসিঠাট্টাতেই দিন কাটাতেন। এঁদের মুখে কোন সাহিত্য-আলোচনা শুনিনি। রবীন্দ্রনাথের স্ফূর্ত্তিই আমাকে মুগ্ধ করে। আর একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করি,- রবীন্দ্রনাথের ভাষা।

এর মাসখানেক পরেই আমি দাদার সঙ্গে কলকাতায় আসি, আর তদবধি এইখানেই রয়ে গেছি। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় হপ্তায় দু'তিন দিন আমাদের বাসায় আসতেন। সেই সময়েই আমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হই। তাঁর "কড়ি ও কোমল" সম্পাদনার ভার দাদা নিয়েছিলেন, এবং এ বিষয়ে তাঁদের যা আলোচনা হত তা'তে যোগ না দিলেও, সে ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকতুম। এর কারণ আমি তখন রোগমুক্ত হয়ে convalescent অবস্থায়, তাই কলেজ যেতুম না, বাড়ীতেই থাকতুম। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা শুনে আমি আবিষ্কার করি যে, কবিতা সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি ছিল। আমি তখন বাঙলা জানতুম, কেননা আমি ছাত্রবৃত্তিপড়া ছেলে ; আর ইংরাজীও মন্দ জানতুম না। তাই রবীন্দ্রনাথের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারতুম। আর একরকম রবীন্দ্রনাথের আবহাওয়ায় বাস করে' আমার অন্তরের অঙ্কুরিত মতামত ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল। এবং তাঁর কাব্যের সঙ্গেও পরিচিত হলুম। সেকালে অনেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরোধী ছিলেন ; কিন্তু আমি এই বিরোধী সমালোচকদের কথা উপেক্ষা করতে শিখলুম।

আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মাত্র লিখলুম। আমার পরবর্ত্তী জীবন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এতদূর জড়িয়ে গিয়েছে যে, তার বিবরণ দিতে হলে আমার নিজের জীবনচরিত লিখতে হয়। আমার মহা সৌভাগ্য এই যে, আমার যৌবনের প্রারম্ভে আমি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাভ করি এবং তাঁর মানসিক আবহাওয়াতেই মানুষ হই। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই আমার প্রতি অনুকূল হন, আর এই দীর্ঘ জীবনে আমি তাঁর অনুগ্রহে কোনদিন বঞ্চিত হই নি। আমার অন্তরে একটি প্রচ্ছন্ন অহং ছিল এবং আছে, যা সহজে কারও বাগ মানে না। তিনি যে একজন লোকোত্তর পুরুষ, আজ তা সকলেই স্বীকার করবেন। তিনি কায়মনোবাক্যে পরিচয় দিয়েছেন যে, তাঁর বিচিত্র জীবন হচ্ছে একটি জীবন্ত কাব্য, যা শতদলের মত ফুটে উঠেছে।

আমি মারকে তোমার ভয় করেছি ব'লে।
তাই তো এমন হৃদয় ওঠে জ্বলে ।

টু কি টা কি

জন্ম: ৭ই মে, ১৮৬১ - ৭ই আগস্ট, ১৯৪১ (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ - ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)
বাংলার দিকপাল কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক। তিনি গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি অভিধায় নন্দিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথ এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি। নোবেল ফাউন্ডেশন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটিকে বর্ণনা করেছিল একটি "গভীরভাবে সংবেদনশীল, উজ্জ্বল ও সুন্দর কাব্যগ্রন্থ" রূপে।রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল কলকাতার এক পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে।মাত্র আট বছর বয়সে তিনি প্রথম কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৭ সালে মাত্র ষোলো বছর বয়সে "ভানুসিংহ" ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম ছোটোগল্প ও নাটক রচনা করেন এই বছরেই। রবীন্দ্রনাথ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁর মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বিচিত্র ও বিপুল সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে।

বঙ্গীয় শিল্পের আধুনিকীকরণে তিনি ধ্রুপদি ভারতীয় রূপকল্পের দূরুহতা ও কঠোরতাকে বর্জন করেন। নানান রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস, ছোটোগল্প, সংগীত, নৃত্যনাট্য, পত্রসাহিত্য ও প্রবন্ধসমূহ। তাঁর বহুপরিচিত গ্রন্থগুলির অন্যতম হল *গীতাঞ্জলি*, *গোরা*, *ঘরে বাইরে*, *রক্তকরবী*, *শেষের কবিতা* ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ছোটোগল্প ও উপন্যাস গীতিধর্মিতা, সহজবোধ্যতা, ধ্যানগম্ভীর প্রকৃতিবাদ ও দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত গান *আমার সোনার বাংলা* ও *জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে* যথাক্রমে বাংলাদেশ ও ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত।

কবিতা

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।
সকল আকাশ, সকল ধরা,
বর্ষণেরি বাণী-ভরা।
ঝরঝর ধারায় মাতি
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে।

কবিতা

নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে

নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে,
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে।।
বসব তোমার পথের ধূলার ’পরে,
এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন করে-
তোমার তরে যে জন গাঁথে মালা
গানের কুসুম জুগিয়ে দেব তারে।।
রইব তোমার ফসল-খেতের কাছে
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে।
জেগে রব গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে-
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বালো
বসে রব সেথায় অন্ধকারে।।

নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ব ভ্রমণ

১৯১৩-এ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সারা বিশ্ব ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে আসতে থাকে আমন্ত্রণের পর আমন্ত্রণ। অধিকাংশ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ; জাহাজযোগে বহু দেশে গেছেন ; পরিচিত হয়েছেন বিভিন্ন দেশের বিদ্যজন ও রাজ-রাজড়াদের সাথে। [১] বহু স্থানে, বহু বিদ্যায়তনে, বহু সভায় স্বকণ্ঠে কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর জীবনোপলব্ধি ও দর্শন এবং তাঁর কাব্যের মর্মবাণী এভাবে কবি সরাসরি বিশ্বমানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রবাসের জীবনে তাঁর হাতে পূরবী'র মতো গুরুত্বপূর্ণ কাব্য রচিত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে বহুজন তাঁর কবিতা অনুবাদে উদ্যোগী হয়েছেন।

১৮৭৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঁচটি মহাদেশের তেত্রিশটিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তবে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদ দিলে অন্যান্য দেশসমূহ ভ্রমণ করেছেন ১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর। দেশগুলো হলোঃ ফ্রান্স, হংকং, চীন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা, ইতালি, নরওয়ে, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস, মিশর, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, বার্মা, হল্যান্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, ইরান, ইরাক ও শ্রীলংকা। ১৯৩৪ এ শ্রীলংকা (সিংহল) ভ্রমণ শেষে কবি শান্তিনিকেতনে ফেরেন ২৮ জুন। এরপর তিনি আর বিদেশভ্রমণে যান নি। এই ভ্রমণগুলির মধ্যে অনেকগুলিই রবীন্দ্রনাথের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এর মাধ্যমে তিনি ভারতের বাইরে নিজের রচনাকে সুপরিচিত করে তোলেন এবং প্রচার করেন তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ। একই সংগে বহু আন্তজার্তিক সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

তাঁর বিদেশ ভ্রমণ শুরু হয় ১৮৭৮ সালে প্যারিস হয়ে লণ্ডন গমনের মাধ্যমে। বিদেশ বিভুঁইয়ে অবস্থানকারে খুব ঘরকাতর হয়ে পড়েছিলেন বলে দীর্ঘকার আর বিলেত যাওয়ার কথা ভাবেন নি। তাঁর দ্বিতীয় লণ্ডন ভ্রমণ ১৮৯০-এ। ১৯১২ সালের ২৭ মে রবীন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্র[২] ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণে বের হন। সংগে ছিল নিজের একগুচ্ছ রচনার ইংরেজি অনুবাদ। লন্ডনে মিশনারি তথা গান্ধীবাদী চার্লস এফ. অ্যান্ড্রুজ, অ্যাংলো-আইরিশ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, এজরা পাউন্ড, রবার্ট ব্রিজেস, আর্নেস্ট রাইস, টমাস স্টার্জ মুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর গুণমুগ্ধে পরিণত হন।[৩] ইয়েটস গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের মুখবন্ধটি লিখে দেন। অ্যান্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে এসে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। যুক্তরাজ্যে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের বাটারটনে অ্যান্ড্রুজের ধর্মযাজক বন্ধুদের সঙ্গে কিছুদিন অতিবাহিত করেন কবি।[৪] যুক্তরাষ্ট্র সফরে তিনি লন্ডন ত্যাগ করেন ১৬ জুন ; যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান ১৯ শে অক্টোবরে। তিনি দেশে ফিরে আসেন পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৩ সালের ৬ অক্টোবর। ১৯১৬ সালের ৩ মে থেকে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান।[৫] এই সব বক্তৃতায় কবি তাঁর জাতীয়তাবাদ-বিরোধী মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।[৬] এছাড়াও তিনি রচনা করেন "ন্যাশানালিজম ইন ইন্ডিয়া" নামে একটি প্রবন্ধও। এটি যুগপৎ নিন্দিত ও নন্দিত হয়। রোমা রোঁলা প্রমুখ বিশ্বশান্তিবাদীরা এই প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৭]

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন, ১৯৩০

ভারতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই ৬৩ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ পেরু সরকারের কাছ থেকে পেরু ভ্রমণের একটি আমন্ত্রণ পান। পেরু থেকে তিনি যান মেক্সিকোতেও। উভয় দেশের সরকারই এই ভ্রমণকে স্মরণীয় করে রাখতে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ে ১০০,০০০ মার্কিন ডলার অর্থ দান করেন।[৮] ১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনর্স এয়ার্সে উপস্থিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ।[৯] এই সময় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথেয়তায় ভিলা মিরালরিওতে চলে আসেন কবি। ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি যাত্রা করেন ভারতের উদ্দেশ্যে। ১৯২৬ সালের ৩০ মে ইতালির নেপলসে উপস্থিত হন তিনি। পরদিন রোমে সাক্ষাৎ করেন ফ্যাসিবাদী একনায়ক বেনিতো মুসোলিনির সঙ্গে।[১০] প্রথম দিকে উভয়ের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক থাকলেও, ১৯২৬ সালের ২০ জুলাই প্রথম মুসোলিনির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথ। তারপরই এই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।[১১]

১৯৩২ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে রবীন্দ্রনাথ (প্রথম সারিতে ডান দিক থেকে তৃতীয়) ইরানি মজলিশের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই বছরই রবীন্দ্রনাথ শিরাজ ভ্রমণ করেছিলেন।[১২]

১৯২৭ সালের ১৪ জুলাই দুই সঙ্গীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক চারমাসব্যাপী সফরে বের হন। এই সফরে তিনি ভ্রমণ করেন বালি, জাভা, কুয়ালালামপুর, মালাক্কা, পেনাং, সিয়াম ও সিঙ্গাপুর। "যাত্রী" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।[১৩] ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে প্রায় বর্ষব্যাপী এক সফরে তিনি বেরিয়ে পড়েন ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে। যুক্তরাজ্যে ফিরে তিনি বার্মিংহামে একটি ভাতৃসংঘের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। এই সময় লন্ডন ও প্যারিস নগরীতে তাঁর অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী হয়। বার্মিংহামে বসেই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদানের জন্য তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালা রচনা করেন। এই বক্তৃতাগুলির উপজীব্য ছিল "আমাদের ঈশ্বরের মানবতাবোধ সম্পর্কে ধারণা, বা চিরন্তন মানবের দৈবসত্ত্বা"।

এই সময় তিনি লন্ডনের বার্ষিক কোয়েকার সম্মেলনেও ভাষণ দেন।[১৪] এখানে তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় ও ব্রিটিশদের সম্পর্ক। এই প্রসঙ্গে তিনি এক "নিরাসক্তির কৃষ্ণগহ্বর"-এর উল্লেখ করেন। পরবর্তী দুই বছর এই বিষয় নিয়ে তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করেছিলেন।[১৫] পরে তিনি ডার্টিংটন হলে অবস্থান করে তৃতীয় আগা খানের সঙ্গে দেখা করেন।

১৯৩০ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানি পর্যটন করেন। এরপর যান সোভিয়েত ইউনিয়নে।[১৬] অতিন্দ্রীয়বাদী পারসিক কবি হাফিজের কিংবদন্তি ও রচনার গুণমুগ্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩২ সালের এপ্রিলে জীবনের শেষপর্বে তিনি তাই যান ইরানে। গ্রহণ করেন রেজা শাহ পাহলভির আতিথেয়তা।[১৭][১৮] এই ভ্রমণের সময়েই তিনি সফর করেন ইরাক (১৯৩২) ও সিংহল (১৯৩৩)।

জীবনের শেষার্ধব্যাপী এই বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ হেনরি বার্গসন, আলবার্ট আইনস্টাইন, রবার্ট ফর্স্ট, টমাস মান, জর্জ বার্নার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েলস ও রোমা রোঁলা প্রমুখ সমসাময়িক যুগের বিশিষ্ট বহু ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।[১৯][২০] পরিচিত হয়েছেন অসংখ্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে। এর ফলে জগৎব্যাপী মানব সমাজের নানা বিভাজন ও জাতীয়তাবাদের প্রকৃত স্বরূপটি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন কবি।[২১]

পাদটীকা

১ Dutta & Robinson 1995, pp. 374–376
২ "History of the Tagore Festival", Tagore Festival Committee (University of Illinois at Urbana-Champaign: College of Business), হয়েছে: 13 August 2009
৩ Dutta & Robinson 1995, pp. 178–179
৪ Chakravarty 1961, pp. 1–2
৫ Dutta & Robinson 1995, p. 206
৬ Hogan, PC; Pandit, L (2003), , প্রকাশক: Fairleigh Dickinson University Press, p. 56–58, আইএসবিএন 0-8386-3980-1
৭ Chakravarty 1961, p. 182
৮ Dutta & Robinson 1995, p. 253
৯ Dutta & Robinson 1995, p. 256
১০ Dutta & Robinson 1995, p. 267
১১ Dutta & Robinson 1995, pp. 270–271
১২ Photo of Tagore in Shiraz
১৩ Chakravarty 1961, p. 1

১৪ Dutta & Robinson 1995, pp. 289-292
১৫ Dutta & Robinson 1995, pp. 303-304
১৬ Dutta & Robinson 1995, pp. 292-293
১৭ Chakravarty 1961, p. 2
১৮ Dutta & Robinson 1995, p. 315
১৯ Chakravarty 1961, p. 99
২০ Chakravarty 1961, pp. 100-103
২১ Dutta & Robinson 1995, p. 317

নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) অনুসারী কবি। তাঁর কবিকাহিনী, বনফুল ও ভগ্নহৃদয় কাব্য তিনটিতে বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পর্বের সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান ও কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু ছিল মানব হৃদয়ের বিষণ্ণতা, আনন্দ, মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রেম। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত মানসী এবং তার পর প্রকাশিত সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০) ও ক্ষণিকা (১৯০০) কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত রোম্যান্টিক ভাবনা। ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

এই চিন্তা ধরা পড়েছে নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪) ও গীতালি (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থে। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটলে বলাকা (১৯১৬) কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিবর্তে আবার মর্ত্যজীবন সম্পর্কে আগ্রহ ফুটে ওঠে। পলাতকা (১৯১৮) কাব্যে গল্প-কবিতার আকারে তিনি নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। পূরবী (১৯২৫) ও মহুয়া (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আবার প্রেমকে উপজীব্য করেন। এরপর পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬) ও শ্যামলী (১৯৩৬) নামে চারটি গদ্যকাব্য প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ দশকে কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকটি নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময়কার রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১) ও শেষ লেখা (১৯৪১, মরণোত্তর প্রকাশিত) কাব্যে মৃত্যু ও মর্ত্যপ্রীতিকে একটি নতুন আঙ্গিকে পরিস্ফুট করেছিলেন তিনি। শেষ কবিতা "তোমার সৃষ্টির পথ" মৃত্যুর আট দিন আগে মৌখিকভাবে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলি, উপনিষদ্, কবীরের দোঁহাবলি, লালনের বাউল গান ও রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে প্রাচীন সাহিত্যের দুরূহতার পরিবর্তে তিনি এক সহজ ও সরস কাব্যরচনার আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন।

আবার ১৯৩০-এর দশকে কিছু পরীক্ষামূলক লেখালেখির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাস্তবতাবোধের প্রাথমিক আবির্ভাব প্রসঙ্গে নিজ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছিলেন কবি। বহির্বিশ্বে তাঁর সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থটি হল গীতাঞ্জলি।

এ বইটির জন্যই তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। নোবেল ফাউন্ডেশন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটিকে বর্ণনা করেছিল একটি "গভীরভাবে সংবেদনশীল, উজ্জ্বল ও সুন্দর কাব্যগ্রন্থ" রূপে।[

নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার। মূলত হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, সবুজ পত্র প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলির চাহিদা মেটাতে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলি রচনা করেছিলেন। এই গল্পগুলির উচ্চ সাহিত্যমূল্য-সম্পন্ন।[রবীন্দ্রনাথের জীবনের "সাধনা" পর্বটি (১৮৯১-৯৫) ছিল সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল পর্যায়। তাঁর গল্পগুচ্ছ গল্পসংকলনের প্রথম তিন খণ্ডের চুরাশিটি গল্পের অর্ধেকই রচিত হয় এই সময়কালের মধ্যে। গল্পগুচ্ছ সংকলনের অন্য গল্পগুলির অনেকগুলিই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রজীবনের সবুজ পত্র পর্বে (১৯১৪-১৭; প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার নামানুসারে) তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল "কঙ্কাল", "নিশীথে", "মণিহারা", "ক্ষুধিত পাষাণ", "স্ত্রীর পত্র", "নষ্টনীড়", "কাবুলিওয়ালা", "হৈমন্তী", "দেনাপাওনা", "মুসলমানীর গল্প" ইত্যাদি। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ লিপিকা, সে ও তিনসঙ্গী গল্পগ্রন্থে নতুন আঙ্গিকে গল্পরচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি বা আধুনিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতেন। কখনও তিনি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণকেই গল্পে বেশি প্রাধান্য দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোটগল্প অবলম্বনে চলচ্চিত্র, নাটক ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে। তাঁর গল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রায়ণ হল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তিন কন্যা ("মনিহারা", "পোস্টমাস্টার" ও "সমাপ্তি" অবলম্বনে) ও চারুলতা ("নষ্টনীড়" অবলম্বনে) , তপন সিংহ পরিচালিত অতিথি, কাবুলিওয়ালা ও ক্ষুধিত পাষাণ, পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত স্ত্রীর পত্র ইত্যাদি।

নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যসলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট তেরোটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এগুলি হল: বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮), গোরা (১৯১০), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) ও চার অধ্যায় (১৯৩৪)। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এদুটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা। এরপর থেকে ছোটগল্পের মতো তাঁর উপন্যাসগুলিও মাসিকপত্রের চাহিদা অনুযায়ী নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজ পত্র, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

চোখের বালি উপন্যাসে দেখানো হয়েছে সমসাময়িককালে বিধবাদের জীবনের নানা সমস্যা।[নৌকাডুবি উপন্যাসটি আবার লেখা হয়েছে জটিল পারিবারিক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে। গোরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সংঘাত ও ভারতের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি। ঘরে বাইরে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা আরও সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে তাঁর পরবর্তী যোগাযোগ উপন্যাসেও।[চতুরঙ্গ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের "ছোটগল্পধর্মী উপন্যাস"।[স্ত্রীর অসুস্থতার সুযোগে স্বামীর অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি – এই বিষয়টিকে উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ দুই বোন ও মালঞ্চ উপন্যাসদুটি লেখেন। এর মধ্যে প্রথম উপন্যাসটি মিলনান্তক ও দ্বিতীয়টি বিয়োগান্তক। রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস চার অধ্যায় সমসাময়িক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি বিয়োগান্তক প্রেমের উপন্যাস।[

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যজিৎ রায়ের ঘরে বাইরে)[ও ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখের বালি।

নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র এবং পত্রসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এইসব প্রবন্ধে তিনি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, সংগীত ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধগুলি সমাজ (১৯০৮) সংকলনে সংকলিত হয়েছে।[রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে লেখা রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে কালান্তর (১৯৩৭) সংকলনে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা ও আধ্যাত্মিক অভিভাষণগুলি সংকলিত হয়েছে ধর্ম (১৯০৯) ও শান্তিনিকেতন (১৯০৯-১৬) অভিভাষণমালায়। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে ভারতবর্ষ (১৯০৬), ইতিহাস (১৯৫৫) ইত্যাদি গ্রন্থে।

সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬) ও সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদি ভারতীয় সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন যথাক্রমে প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭) ও আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭) গ্রন্থদুটিতে।[লোকসাহিত্য (১৯০৭) প্রবন্ধমালায় তিনি আলোচনা করেছেন বাংলা লোকসাহিত্যের প্রকৃতি।[ভাষাতত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ রয়েছে শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮) ইত্যাদি গ্রন্থে। ছন্দ ও সংগীত নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন যথাক্রমে ছন্দ (১৯৩৬) ও সংগীতচিন্তা (১৯৬৬) গ্রন্থে।[

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন শিক্ষা (১৯০৮) প্রবন্ধমালায়।[ন্যাশনালিজম (ইংরেজি: Nationalism, ১৯১৭) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণ করে তার বিরোধিতা করেছেন।[১৪৬] অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন বিষয়ে যে বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি রিলিজিয়ন অফ ম্যান (ইংরেজি: Religion of Man, ১৯৩০; বাংলা অনুবাদ মানুষের ধর্ম, ১৯৩৩) নামে সংকলিত হয়।[

নিবন্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা জন্মদিনের অভিভাষণ সভ্যতার সংকট (১৯৪১) তাঁর সর্বশেষ প্রবন্ধগ্রন্থ।[জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭) নামে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০) ও আত্মপরিচয় (১৯৪৩) তাঁর আত্মকথামূলক গ্রন্থ।[

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পত্রসাহিত্য আজ পর্যন্ত উনিশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী (ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা), ভানুসিংহের পত্রাবলী (রানু অধিকারীকে (মুখোপাধ্যায়) লেখা) ও পথে ও পথের প্রান্তে (নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা) বই তিনটি রবীন্দ্রনাথের তিনটি উল্লেখযোগ্য পত্রসংকলন।

নিবন্ধ

রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক দর্শন অত্যন্ত জটিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করতেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত মানসী কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার তথ্যপ্রমাণ এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ গদর ষড়যন্ত্রের কথা শুধু জানতেনই না, বরং উক্ত ষড়যন্ত্রে জাপানি প্রধানমন্ত্রী তেরাউচি মাসাতাকি ও প্রাক্তন প্রিমিয়ার ওকুমা শিগেনোবুর সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন।[আবার ১৯২৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে স্বদেশী আন্দোলনকে "চরকা-সংস্কৃতি" বলে বিদ্রুপ করে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় তার বিরোধিতা করেন।[ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁর চোখে ছিল "আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির রাজনৈতিক উপসর্গ"। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বৃহত্তর জনসাধারণের স্বনির্ভরতা ও বৌদ্ধিক উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। ভারতবাসীকে অন্ধ বিপ্লবের পন্থা ত্যাগ করে দৃঢ় ও প্রগতিশীল শিক্ষার পন্থাটিকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান রবীন্দ্রনাথ।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথেয়তায় মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর পত্নী কস্তুরবা গান্ধী, ১৯৪০।

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের মতাদর্শ অনেককেই বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯১৬ সালের শেষ দিকে সানফ্রান্সিসকোয় একটি হোটেলে অবস্থানকালে একদল চরমপন্থী বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাঁদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি নাইটহুড বর্জন করেন।[

নিবন্ধ

নাইটহুড প্রত্যাখ্যান-পত্রে লর্ড চেমসফোর্ডকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমার এই প্রতিবাদ আমার আতঙ্কিত দেশবাসীর মৌনযন্ত্রণার অভিব্যক্তি।" রবীন্দ্রনাথের "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য" ও "একলা চলো রে" রাজনৈতিক রচনা হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। "একলা চলো রে" গানটি গান্ধীজির বিশেষ প্রিয় ছিল। যদিও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর। হিন্দু নিম্নবর্ণীয় জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজি ও আম্বেডকরের যে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়, তা নিরসনেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গান্ধীজিও তাঁর অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

সুরকার রবীন্দ্রনাথ

- হিমাংশুকুমার দত্ত

এই নিবন্ধখানি কবিতা পত্রিকার বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত পুরনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।

সুরকার (composer) হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব আমরা ক্রমশই উপলব্ধি করতে শিখছি এবং যত দিন যাবে ততই আরো বেশী উপলব্ধি করতে পারবো। কিছুদিন আগেও ওস্তাদ মহলে রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে ঈষৎ অবজ্ঞার ভাব ছিল। কিন্তু আজকাল ওস্তাদরাও মুখে অন্তত রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য মানেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্য্যায়ের গানগুলি হয় কোনো-না-কোনো বিখ্যাত হিন্দি গানের অনুকরণে, নয় প্রচলিত রাগ রাগিনীর অনুসরণে রচিত ; এই পর্য্যায়ের গানগুলো সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না কারণ তখন পর্য্যন্ত তাঁর সুরের বৈশিষ্ট্য কিছু ফোটেনি। কিন্তু প্রচলিত সুরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তিনি ক্রমে ক্রমে নতুন ও নিজস্ব সুর সৃষ্টি করতে লাগলেন, সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁর সুরের একটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্য কি ? তিনি আমাদের রাগ-রাগিনীর বাঁধা পথ ছেড়ে নিজস্ব সৌন্দর্য্যানুভূতি থেকে নতুন নতুন মিশ্রণ ও ঢঙের প্রবর্ত্তন করেছেন। যে সময়ে তিনি এসব করতে আরম্ভ করেন সে সময়ে খাঁটি সাঙ্গীতিক মহলে এর সম্বন্ধে অবহেলা এবং বিরোধিতার ভাব ছিল, তার কারণ আমাদের প্রচলিত সুরের সঙ্গে এর যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছিল। তখন আমাদের অনভ্যস্থ কানে সে সব সুর ভালো লাগেনি। আজ কুড়ি পঁচিশ বছর পরে সে সব গান লোকের মুখে মুখে ফিরছে, এতে বোঝা যায় যে ভালো জিনিষ কখনো চাপা থাকে না, তার যোগ্য সমাদর শুধু সময়সাপেক্ষ। বাংলা দেশের বাউল ও উত্তর ভারতের ভজন গানের যে বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বও সেই স্তরের। বাউল ভজন রচনা করেছেন যে সব সাধুসন্তরা তাঁরা ভাবাবেগে প্রচলিত সুর থেকে বিচ্যুত হলেও তাঁদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধের ফলে সেই বিচ্যুতিগুলোও শুধু যে মধুর হয়েছে তা নয়, জনসাধারণ সেগুলো সাগ্রহে মেনে নিয়েছে এবং সেগুলো স্থায়ীও হয়েছে। দাদুর একটি কথা আছে –

অনুভব জঁহাহৈ উপজৈ শবদকিয়া নিবাস।

সঙ্গীতের উৎস অন্তরের অন্তঃস্থল, রবীন্দ্রনাথ অন্তরধনে এতই ধনী যে নিত্য নতুন সুরের উৎস তিনি তাঁর নিজের মনেই পেয়েছেন।
বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কতগুলো নতুন রাগ রচনা করেছেন। তার মধ্যে হেমন্তরাগ খুব প্রসিদ্ধ। এই রাগের জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ, আরোহাবরোহস্বরূপ স গ ম ধ ন র্স, র্স ন ধ প ম গ র স ; রাগ পরিচয়াত্মক স্বরবিন্যাস স গ র স, ম ধ ন র্স ন ধ প ম, গ প ম, গ র স। এটি অতি শান্তরসাত্মক রাগ। আমাদের দেশে প্রচলিত পুরোনো ধ্রুপদাঙ্গের সোহিনী রাগের সহিত রিখাব ও পঞ্চম (অবরোহণে) যোগ ক'রে এই রাগের সৃষ্টি করেছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। এবং এই রিখাব ও পঞ্চমের ব্যবহার অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়েছে, এজন্যে এই নতুন রাগের সৃষ্টি সার্থক। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটি শুনেছেন তাঁরা সুরটি বিশ্লেষণ করলে দেখবেন এতে সেই হেমন্ত রাগই রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন রাগ, রাগিনী, মেল, জাতি, আরোহ, অবরোহ, বাদী, সম্বাদী বিচার করে যা সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ শুধু সহজ সৌন্দর্য্যানুভূতি থেকে তাই সৃষ্টি করেছেন। ইওরোপীয় সংগীতে D Major Keyতে দু'টি sharp ব্যবহার হয়। আমাদের ভারতীয় সংগীতে কল্যাণ ঠাটে একটি কড়ি (sharp) ব্যবহার হয়। একাধিক কড়ির ব্যবহার নেই। রবীন্দ্রনাথের 'আমার একটি কথা' এই গানটিতে তিনি পাশাপাশি দুই রিখাব লাগিয়েছেন। এই দুই রিখাবের কোমল রিখাবটি আর কিছু নয়, D Major Key-র C sharp (কড়ি স)। ইওরোপীয় সংগীতপদ্ধতির এই প্রয়োগ এখানে খুবই নিপুণ। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বাউল ঢংয়ের সুর 'কবে তুমি আসবে ব'লে' এবং বিখ্যাত ভাটিয়ালি সুরের গান 'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' এই দুটি গানেই আ-আ-আ ব'লে যে টান আছে তাতে স্বরোচ্চারণ সম্পূর্ণ ইওরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী। অনেকে বলতে পারেন বাউল ভাটিয়ালির সঙ্গে ইওরোপীয় ঢংয়ের সংমিশ্রণ হাস্যকর, কিন্তু গান দু'টি মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে যে এক্ষেত্রে তা তো হয়ইনি, বরং এই মিশ্রণের ফল অতি সুন্দর হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে বড় প্রতিভার নিপুণ হাতে বিভিন্ন আপাতবিরোধী জিনিষেরও মিশ্রণের ফলে নতুন সৌন্দর্য্য জন্ম নেয়।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ দেশী ও বিদেশী প্রভাব নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রে সেগুলির সমন্বয় সাধন করেছেন, এবং তাঁর সুরের অভিনবত্বের এই হচ্ছে মূল কথা। ছেলেবেলা থেকে নিজের বাড়িতে তিনি দিশি বড় বড় ওস্তাদ সকলের গানই শুনেছেন, তারপর তাঁদের পরিবারের সংস্কৃতি এতই উন্নত ছিল যে ইওরোপীয় সংগীতেও তিনি বাল্যকাল থেকেই অভ্যস্থ, তাছাড়া বাউল ভাটিয়ালি ইত্যাদি বাংলার নিজস্ব সুরগুলির সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হবার সুযোগও তাঁর হয়েছে।

এই ত্রিস্রোত গিয়ে মিশেছে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে, তাঁর মনের রসায়নে মিশে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করেছে আজকাল যাকে আমরা রবীন্দ্রসংগীত বলি।

রবীন্দ্রসংগীতে এই তিনধারার কোনো ধারাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে নেই, অথচ প্রচ্ছন্নভাবে এই তিনটি ধারাই আছে। এদেরই সমন্বয়ের ফলে যে অভিনব সৃষ্টি হয়েছে সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এখানেই পরিচয়। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা পেয়েছেন ব'লেই তাঁর সুরের বৈচিত্র্য এত বেশী। অবশ্য একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে রবীন্দ্রনাথের গান একঘেয়ে। এর মত ভুল কথা আর নেই। সাধারণ লোকের এরকম ধারণা হবার কারণ রবীন্দ্রনাথের গানের অফুরন্ত সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। যিনি প্রায় দু'হাজার গান লিখেছেন তাঁর কিছু-কিছু গান এক ঢংয়ের হতে বাধ্য ; গায়ক-গায়িকারা অনেক সময় পর-পর অনুরূপ ঢংয়ের গান করেন ব'লে শ্রোতাদের মনে এই রকম ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় যে রবীন্দ্রনাথের গান একঘেয়ে। আসলে তাঁর গানে সুরের বৈচিত্র্য যত বেশী কোনো ভারতীয় সুরকারের রচনায় আজ পর্য্যন্ত ততটা দেখা যায়নি ; তাঁর বিভিন্ন গানগুলোর সুর বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেই একথা স্পষ্ট হবে।

একথা বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় composer. সদারঙ প্রভৃতি প্রাচীন সুরকারদের ইওরোপীয় আদর্শে ঠিক composer বলবার উপায় নেই, কারণ তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিগুলোকে নির্দ্দিষ্টভাবে বেঁধে যেতে পারেন নি। এখন আমাদের হাতে যা প্রমাণ আছে তা থেকে তার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

রচিত সুরগুলি এত বিভিন্ন ও বিকৃতভাবে পাও যে তা থেকে তাদের মূল রূপ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করা যায় না, এবং এই বিকৃতির জন্য দায়ী আমাদের দেশের 'গায়কী' পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই 'গায়কী' পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করেন – আমাদের দেশে তিনিই প্রথম জোর দিয়ে বলেন যে সুরকারের সৃষ্টি নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়, তার উপর একচুল অদল-বদল করবার অধিকার কোনো গায়কের নেই। সুরের এই নির্দ্দিষ্ট রূপের উপর জোর দেয়াটাই composer-এর প্রথম লক্ষণ।

কবির রচিত কবিতা যেমন একটি সম্পূর্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় জিনিস, অতি বড় ভক্ত পাঠকেরও অধিকার নেই নিজের পছন্দমত কবিতার কথা বদ্‌লে নেবার, তেমনি গানের সুরও যে সুরকারের নির্দ্দিষ্ট একটি সৃষ্টি তাতে কোনো অদল-বদলই চলে না এ ধারণা আমাদের দেশে একেবারেই ছিল না, রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের মাথায় একথা ঢুকিয়েছেন। দশ পনেরো বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার' ইমনকল্যাণ থেকে ভৈরবীতে পরিবর্ত্তিত হয়ে রেকর্ডে প্রকাশিত হয় এবং 'একদা তুমি প্রিয়ে'র ঝাঁপতাল থেকে দাদরায় পরিবর্ত্তন ঘটে – সেও রেকর্ডে। কিন্তু আজ রেকর্ড-কোম্পানীগুলো রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুমোদন ব্যতীত তাঁর কোনো সুর প্রকাশ করতে সাহস পায় না ; সুরকারকে এতখানি স্বীকার করা রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছে, এবং এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতের সুরকারদের পথ তিনিই সুগম করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা যতটা সমাদৃত হয়েছে তাঁর সুর এখন পর্য্যন্ত ততটা হয়নি তার কারণ সাহিত্যের দিক থেকে বাংলাদেশ যতটা অগ্রণী সংগীতের দিকে এখনো ততটা নয়। তবে এ-কথাও সত্য যে গত পনেরো কুড়ি বছরের মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীতের আদর আমাদের দেশে অনেকটা বেড়েছে তার কারণ সংগীত রসবোধ বাঙালীদের মধ্যে বাড়ছে। এমন আশা করা অন্যায় হয় না যে কবিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গান যতখানি সম্মান পেয়েছে, তাঁর সুরও একদিন ততখানি সম্মানই পাবে।

সঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ.....

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন স্বনামধন্য সংগীতস্রষ্টা ও বিশিষ্ট চিত্রকর। তিনি প্রায় ২,২৩০টি গান রচনা করেন। রবীন্দ্রসংগীত নামে পরিচিত এই গীতিগুচ্ছ বাংলার সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর সাহিত্যের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত – তাঁর বহু কবিতা যেমন গানে রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনই তাঁর উপন্যাস, গল্প বা নাটকেও বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে তাঁর গান। তাঁর গানের মূল উৎস হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের ঠুমরি শৈলী।

প্রথম জীবনে লেখা করুণ ব্রাহ্ম ধর্মসঙ্গীত থেকে ছদ্ম-কামোদ্দীপক লঘু সঙ্গীত – রবীন্দ্রনাথের গান সকল প্রকার মানবিক আবেগকেই সুরবদ্ধ করেছে। বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রীয় রাগের সুরগত সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করেছে এই গানগুলি। কখনও কখনও কোনো নির্দিষ্ট রাগের তান ও ছন্দকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছে। আবার কখনও রচনার সৃষ্টিসৌকর্যকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন একাধিক রাগের উপাদান।[শুধু হিন্দুস্তানি সংগীতই নয়, রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে কর্ণাটিক শাস্ত্রীয় সংগীত, বাংলা লোকসঙ্গীত এমনকি ইংরেজি ব্যালাড ও স্কটিশ লোকগীতিও।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রদত্ত একটি তালিকা অনুসারে, রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান, অর্থাৎ, অপরের সঙ্গীত থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রচিত গানের সংখ্যা ২৩৪। স্বরচিত কবিতা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সুর দেন বিভিন্ন বেদগান এবং বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল ও সুকুমার রায়ের গীতিকবিতাতেও। ভারতের জাতীয় স্তোত্র বন্দেমাতরম-এর সুরও রবীন্দ্রনাথই দেওয়া।

সঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ.....

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবেগময়ী শক্তি ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ বাঙালি সমাজে অমোঘ। মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে লেখা হয়, "বাংলায় এমন কোনো শিক্ষিত গৃহ নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া বা অন্ততপক্ষে গাওয়ার চেষ্টা করা হয় না...

এমনকি অশিক্ষিত গ্রামবাসীরাও তাঁর গান গেয়ে থাকেন।" দি অবজার্ভার-এর আর্থার স্ট্রেঞ্জওয়েজ তাঁর মিউজিক অফ হিন্দুস্তান রচনায় অবাঙালিদের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

এই গানগুলি হল "vehicle of a personality ... [that] go behind this or that system of music to that beauty of sound which all systems put out their hands to seize." বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি দুটি রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা।

এছাড়াও, বিশিষ্ট সেতার বাদক বিলায়েৎ খান, সরোদিয়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও আমজাদ আলি খানের বাদনশৈলীকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে রবীন্দ্রসংগীত।[গীতবিতান সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সব গান।

আকাশ ভরা সূর্য-তারা

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

গান

স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক

কৌতুকনাট্য

ব্রহ্মা: পুরন্দর, তোমাদের অত্যন্ত কৃশ দেখাচ্ছে, যেন অনাবৃষ্টিদিনের পাতা-ঝরা বনস্পতির মতো। স্বর্গে কি অমৃত-সঞ্চয়ে দৈন্য ঘটেছে?

ইন্দ্র: পিতামহ, অনাবৃষ্টিই তো বটে। স্বর্গীয় বনস্পতির শিকড় আছে মর্ত্যের মাটিতে–দিনে দিনে সেখানে শ্রদ্ধার রস শুকিয়ে এসেছে। নরলোকে কানাকানি চলছে, যে সৃষ্টিব্যাপারটা আকস্মিক মহামারীর মতো, বসন্তের গুটি যেন, আপনা হতেই আপনাকে হঠাৎ ফুটিয়ে তোলে; এটা দেবতার হাতের কারুকার্য নয়। অর্থাৎ এটা এমন একটা রোগ, যা চলছে মৃত্যুর অনিবায পরিণামে। এমন-কি, ওখানকার পন্ডিতরা চরম চিতানলের দিনক্ষন পযন্ত অঙ্ক কষে স্থির করে দিয়েছে।

ব্রহ্মা: সর্বনাশ। এ যে অনাদিকালের ভূতভাবনের বেকার-সমস্যা।

ইন্দ্র: তাই তো বটে। ওরা বলছে, দেবতারা কোনোদিন কোনো কাজই করে নি অতএব ওদের মজুরি বন্ধ।

ব্রহ্মা: বলো কী, হোমনলের ঘৃতটুকুও মিলবে না?

ইন্দ্র: না পিতামহ। সেটা ভালোই হয়েছে–যে ঘৃতের এখন চলতি সেটাতে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য হবার আশঙ্কা।

বৃহস্পতি: আদিদেব, এতদিন ছিলুম মানুষের অসংশয় বিশ্বাসের–অত্যন্তই নিশিন্ত ছিলুম। এখন পন্ডিতের দল মনোবিজ্ঞানের এক্কাগাড়িতে চাপিয়ে মানুষের মাথার খুলির একটা অকিঞ্চিৎকর কোটরে আমাদের ঠেলে দিয়েছে; সেখানে মগজের গন্ধ আছে, অমৃতের স্বাদ নেই; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বেড়ার মধ্যে আমাদের ঘের দিয়ে দিয়ে রেখেছে–যাকে ম্লেচ্ছভাষায় বলে কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্প–কড়া পাহারা! অবতারের যে পুরতত্ত্ব বের করেছে।

মরুৎ: আমার পুত্র মারুতিকে ওরা অগ্রজ ব'লে স্বীকার করেছে এতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লজ্জার বিষয় এই যে, দেবতারা ভুক্ত হয়েছে অ্যান্থ্রপলজি নামক অর্বাচীন ম্লেচ্ছশাস্ত্রের বাল্যলীলা পর্বে। দেব, আশা দিয়েছিলে আমরা অমর, আজ দেখছি ওদের পরীক্ষাগারে ব্যাঙের একটা কাটা পাও ইন্দ্রপদের চেয়ে বেশি সজীব। সেদিন সুরবালকেরা সুরগুরুকে ধরে পড়েছিল, 'প্রমাণ ক'রে দিন আমরা আছি'। গুরুর সন্দেহে দোলা লাগল—আছি কি নেই এই তালে তাঁর মাথা নড়তে লাগল, মুখ দিয়ে কথা বেরল না। পিতামহ যদি সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দেন তা হলে দেবলোক সুস্থ হতে পারে।

ন পিতামহের চার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। মনে ভাবছি মরলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের আচার্য হয়ে জন্মাতে পারি তা হলে অন্তত কোনো এক চৌমাথার ট্রাম লাইনের ধারে একটা পাথরের মূর্তি দাবি করিতে পারব। আজ আমার মূর্তির ভাঙা টুকরো নিয়ে প্রফেসর তারিখ হিসাব করছে অথচ এতদিন এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে আমি সকল তারিখের অতীত।

প্রজাপতি: ভগবান্, সকলেই জানেন ধরাধামে আমি আর কন্দর্পদেব অবতীর্ণ হয়েছিলুম শুভ এবং অশুভ বিবাহের ঘটকালিতে। সেজন্যে আমাদের কোনো রকমের নিয়মিত বা অনিয়মিত পাওনা ছিলনা, কেবল নিমন্ত্রণপত্রের মাথার উপরে ছাপার অক্ষরে আমার উদ্দেশে একটা নমস্কার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু কৌতুক ছিল ভূরি-পরিমাণে। বাসর-ঘরে অনেকে কানমলা দেখেছি পরিহাস-রসিকাদের হাতে, আর দেখেছি অদৃশ্য পরিহাস-রসিকের হাতে চিরজীবনের কান-মলা। আমি প্রজাপতি আজ লজ্জিত, কন্দর্প আজ নির্জীব—তিনি পঞ্চাশর নিয়ে যখন আস্ফালন করিতে যান তখন তীরগুলো ঠিকরে যায় কোম্পানির কাগজ-নির্মিত বর্মের 'পরে।
অতএব উক্ত বিভাগের সনাতনী খাতা থেকে আমাদের নাম কেটে নিয়ে টঙ্কেশ্বরী দেবীর নাম বহাল হোক।
সকলে। তথাস্তু।

বায়ু: পৃথিবীতে আজকাল পাগলা হাওয়া পলিটিক্সের ঈশান কোণ থেকে সৃষ্টি ছারখার করতে প্রবৃত্ত। আমি আজ চন্দ্রলোকে সমস্ত বিরহিণীদের দীর্ঘনিশ্বাস বহন ক'রে ফিরে যেতে ইচ্ছা করি।

অশ্বিনীকুমার: সুবিধা হবে না দেব। মর্ত্যের পন্ডিতেরা ঘোষনা করে দিয়েছেন যে, চন্দ্র বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি করেন বটে, কিন্তু স্বয়ং তিনি বায়ুহারা।
বায়ু। নাহয় সেখানে গিয়ে আত্মহত্যা করব।

ভোলেনাথা: (অর্ধনিমীলিত নেত্রে) আমার চেয়ে গাঁজার মৌতাত অনেক প্রবল, পৃথিবীতে এমন সর্বনেশে ওস্তাদের অভাব নেই–সেই-সব সংস্কারকদের উপর প্রলয়কাযের ভার দিয়ে আমি গঙ্গাধারাভিষেকে মাথা ঠান্ডা করতে পারি। আমার ভূতগুলোর ভার তাঁরাই নিতে পারবেন।
চিত্রগুপ্ত। মনঃক্ষোভে দেবগনের অভিযোগে অত্যুক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যথাযথ তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করি। সুরগুরু কোনোদিন সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি। সেইজন্যে দেবতাদের গণিত স্বেচ্ছাগণিত। মর্ত্যে দেবগণের অধিকারে কী পরিমাণে খর্বতা ঘটেছে তার নির্ভুল সীমা নির্ণয়ের জন্য স্বপ্নাদেশ দেওয়া হোক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংখ্যিক প্রমাণ-বিশারদের মাথায়; এ কাজে বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি অত্যাবশ্যক।

বায়ু: এ প্রস্তাবের সমর্থন করি। দেবতাদের হতাশ হবার কারণ নেই। মানুষের বুদ্ধিতে অকস্মাৎ হাওয়াবদল বার বারই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত দুর্দিনে। দেউলে হবার দিনে মাতনের খরচ বেড়ে ওঠে। মানুষের বুদ্ধিতে সব সময় জোয়ার আসে না–একদা তলার পাঁক বেরিয়ে পড়ে। তখন পান্ডার পদপঙ্কের দাম চড়ে যায়, দেবতারাও তার অংশ পান।
বৃহস্পতি। আশ্বস্ত হলুম। (সরস্বতীর প্রতি) মুখ ম্লান করিবেন না, দেবী, মানুষের আত্মবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা কমবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়তে থাকে। বুদ্ধিতে ভাঁটার টান প্রবল, ভূমন্ডলে এমন দেশ আছে। শীতলা ঠাকরুনও সেই ভরসাতেই মন্দির-ত্যাগের আশঙ্কা ছেড়ে দিয়েছেন।

পূব্ব-স্মৃতি

স্মৃতিকথা

পূর্ব্ব-স্মৃতি প্রমথ চৌধুরীর এক সাংগীতিক স্মৃতিকথা। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত *গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০* সংকলনে এটি প্রকাশিত হয়। পুরনো বানান ও ভাষারীতি অপরিবর্তিত।

আমাদের পরিবারের আদি পূর্ব্বপুরুষের নাম হচ্ছে যাদু-কীর্ত্তনীয়া, ওরফে যাদবানন্দ চৌধুরী। যাদু-কীর্ত্তনীয়ার পুত্র জমিদার হয়ে ওঠেন। এবং সেই সময় থেকেই 'চৌধুরী' আমাদের পারিবারিক উপাধি হয়ে উঠ্‌ল।

আমাদের পরিবারে গান-বাজনার রেওয়াজ একেবারে উঠে গেল। মুর্শিদকুলি-খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন তখন আমাদের জমিদারীর ভিতপত্তন হয়। এবং অদ্যাবধি এ পরিবার বেঁচে আছে। কিন্তু এ দীর্ঘকালের মধ্যে চৌধুরীবাবুদের কেউ গাইয়ে-বাজিয়ে হয়েছেন বলে শুনিনি।

অতএব আমি গানবাজনার আবহাওয়ার ভিতর মানুষ হইনি। আমার পৈতৃক ভদ্রাসন হচ্ছে হরিপুর গ্রাম, জেলা পাবনা। কিন্তু আমার জন্ম যশোর-সহরে। পাঁচবৎসর বয়সে আমি যশোর ত্যাগ করি। যশোরেও কোন গানবাজনা শুনিনি। সেখানে আমাদের বাড়িতে 'মুখুয্যে-মশাই' নামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি সেতার বাজাতেন। কিন্তু সেই পিড়িং পিড়িং আমার মনের উপর কোন ছাপ রেখে যায়নি।

যশোরে একটিমাত্র গান শুনি, - বোধহয় কোন ভিখিরির মুখে। সে-গানটি আমার আজও মনে আছে !-

গড় করি সে মেয়ের পায়
যে পায়ে ধান ভেনে দেয়।

তারপরে কৃষ্ণনগরে এসে আমার কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের মুখে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সদ্য-প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত'-বইয়ের কতকগুলি গান শুনি। তারমধ্যে মনে আছে "গাওহে তাঁহার নাম" (খাম্বাজ চৌতাল)। "দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে" (বাহার একতালা)। আরও একটি গান তিনি গাইতেন মনে পড়ে "দিবা অবসান হল।

বাড়ীতে একটি টেব্‌ল্‌-হারমোনিয়াম ছিল। দাদা সেটি বাজিয়ে গান গাইতেন। তার একটি গানের প্রথম লাইন আমার মনে আছে :-
ওপাড়াতে দুধ যোগাতে যাইগো আমার বেলা হল।
দুঃখের বিষয়, দাদার সুর-সারের কান ছিল না, এবং গানের গলা মোটেই ছিল না। বাড়ী থেকে হারমোনিয়াম বিদায় হবার পর দাদা আর কখনো সঙ্গীতচর্চা করেননি। তারপরে যখন একটি পিয়ানো এল, তখন দিদি এক মিশনারি মেমের কাছে পিয়ানো শিক্ষা সুরু করলেন। তিনি Raindrops Patter-নামক একটি বিলিতী-সুর একআঙ্গুল দিয়ে বাজাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর পিয়ানো-শিক্ষা আমাদের কাছে একটা নিতান্ত উৎপাত বলে' মনে হত। সুখের বিষয় এই যে, দিদির ইংরিজী বাজনা-শিক্ষা এরবেশি আর এগলো না। মিশনারিরা তাঁকে জবাব দিলে, আমরাও বাঁচলুম।
এইসময়ে 'নেত্য'-বলে একটি বৃদ্ধা ঢপ্‌ওয়ালী মধ্যেমধ্যে মা'র কাছে এসে তাঁকে গান শোনাত। কি ভরাট তার গলা ! সে গাইত ভারি ভারি রাগ। অধিকাংশই শ্যামা-বিষয়ের গান। সে ছিল জাতে হাড়ি ; কিন্তু আজীবন সঙ্গীতশিক্ষা আর গান অভ্যাস করে' এ বৃদ্ধবয়সেও আমাদের মুগ্ধ করে' দিত।
এরপর আমি যখন সাড়ে-তেরো বছর বয়সে কলকাতায় পড়তে আসি, তখন আবিষ্কার করে' আশ্চর্য্য হলুম যে, কলকাতায় ভদ্রসন্তানরা একদম সঙ্গীতছুট। আমি যখন হেয়ার-ইস্কুলে পড়ি, তখন একটি ছোক্‌রার মুখে "প্রেমের কথা আর বোলোনা, আর তুলোনা"-এই গানটি শুনি। কি সুর জিজ্ঞাসা করায়, সে বলে "ইটালিয়ান ঝিঁঝিঁট"। অবশ্য আমি তার উত্তরে বলি যে, ঝিঁঝিঁট জানি, ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ জানি, কিন্তু তুমি যা গাইলে তার মধ্যে ঝিঁঝিঁট কোথায়, তা ধরতে পারছিনে। বোধহয় ইটালিতে গেলে তা' জানতে পাব।
তখন "আয়লো অলি কুসুম তুলি ভরিয়ে ডালা"-নামক একটি গান কলকাতায় খুব প্রচলিত ছিল। সে-গান ইস্কুলের ছেলেরা গাইত, আর রাস্তায় গাড়োয়ানেরা গাইত। আমার কানে এ গানের কথা ও সুর ঝাঁটা মার্‌ত।
কলকাতা তখন ছিল এক রকম সঙ্গীতহীনা – অন্ততঃ আমার পক্ষে। কিন্তু বোধহয় সমস্ত কলকাতার বিষয় একথা বলা অন্যায়। কারণ আমি শুধু ছাত্রসমাজই জানতুম, অন্য কোন সমাজ জানতুম না। পরের বৎসর আমি ইস্কুল ছেড়ে যখন প্রেসিডেন্সি-কলেজে ভর্ত্তি হলুম, তখন একটি ছোক্‌রার সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখুয্যে। তার ছিল বিরাট শরীর, আর শুনলুম সে খুব ভাল সেতার বাজায়। পরে তার অপূর্ব্ব সুরবাহার বাজানো শুনেছি।

এবং এইসময়েই আমার লালচাঁদ বড়ালের সঙ্গে পরিচয় হয়। লালচাঁদ আমার সহপাঠী ছিলেন না। আমি যখন প্রেসিডেন্সি-কলেজে ফার্ষ্ট-ইয়ারে পড়ি, তখন তিনি হিন্দু-ইস্কুলে ফোর্থ-ক্লাসে পড়তেন, যদিচ তিনি বয়সে আমার চাইতে বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয়। তিনি হারমোনিয়াম বাজাতেন, এস্রাজ বাজাতেন, বাঁয়াতবলা বাজাতেন এবং গান গাইতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বেজায় হেঁড়ে, আর গাইতেন বেশির-ভাগ রামমোহন রায়ের রচিত গান। তাঁর ঠাকুরদা প্রেমচাঁদ বড়াল আদি-ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম ছিলেন। এবং তাঁর বাড়িতে প্রতিহপ্তায় উপাসনা হত, তা'তে লালচাঁদ গান করতেন। আমি প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় লালচাঁদের বাড়ী যেতুম ও ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে বাড়ী ফিরে আসতুম। তার সেইবয়স থেকেই ভাল ভাল গাইয়ে-বাজিয়ের বাড়ীতে যাওয়া অভ্যাস ছিল। মহেন্দ্র চাটুয্যে নামক জনৈক ওস্তাদ হারমোনিয়াম-বাজিয়ের বাড়ীতে আমি লালচাঁদের সঙ্গে যাই। এবং সেখানে 'ছোটে-ডুঁদিখাঁ'-নামক ওস্তাদের গান শুনি। এই মহেন্দ্র চাটুয্যে ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রসিংহের একটি প্রিয়পাত্র। পরে তিনি নোট জাল করে' আন্দামানে যান। তিনি আন্দামান থেকে ফিরে আসবার পরও আমি একদিন তাঁর বাজনা শুনি। কিন্তু তিনি তাঁর গুণপনা আন্দামানেই রেখে এসেছিলেন।

লালচাঁদের সঙ্গে আমি আরও অনেক গাইয়ে-বাজিয়ের বাড়ীতে যাই। কখনো খাপ্‌রার ঘরে কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাসায় যাই ; তিনি গুণী হতে পারেন, কিন্তু সে-জঘন্য খাপ্‌রার ঘর আমার সহ্য হল না। একবার তাঁর সঙ্গে আমি প্রমথ বাঁড়ুয্যে নামক একটি যুবকের বাড়ী যাই তাঁর বেহালা শুনতে। তিনি ছিলেন অতি সুদর্শন ও মিষ্টভাষী। পরে উক্ত-নামের একটি ব্যক্তি সঙ্গীত-শিক্ষক-হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ-দুই লোক একই ব্যক্তি কিনা, সে-বিষয় আমার সন্দেহ আছে।

সে যাই হোক, সেকালে রবীন্দ্রনাথের কোন গান কারও মুখে শুনিনি। বছরতিনেক কলকাতায় থেকে আমি আবার কৃষ্ণনগর ফিরে যাই। কৃষ্ণনগর আমার ভাল লাগেনি,- সঙ্গীর অভাবে। পূর্ব্বে যারা আমার সহপাঠী ছিল, তারা প্রায় সকলেই কলকাতা চলে গিয়েছিল। তারপর একদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে সত্য লাহিড়ী নামক দাদার সহপাঠী একটি যুবকের গান শুনি। তিনি বাঙ্গালায় একটি কানাড়া সুরের গান করে। এ গান শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। হিন্দী-রাগরাগিনীর ভিতর কানাড়া বলে' যে একটি রাগ আছে, তা আমি এরআগে জানতুম না। তারপর থেকে আমি রোজ সন্ধ্যাবেলা তাঁর ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে জুটতুম। তাঁর বন্ধুবান্ধবরা এবং তাঁর গুরু 'শশীকামার' বলে' একটি ওস্তাদও সেখানে আসতেন। প্রায় নিত্য এই ডিস্পেন্সারিতে নানারকম গানবাজনা শুনেশুনে আমার ক্লাসিকাল গানবাজনার কান তৈরি হল।

বছরখানেক পর রবীন্দ্রনাথ দিন ৪।৫-এর জন্য আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে আসেন। সেখানেই তাঁর গান আমি প্রথম শুনি। গলা ছিল তাঁর আশ্চর্য্য। অথচ তাঁর একেবারে তানবর্জিত। আমার হিন্দীগানে-অভ্যস্ত কানে তাঁর গান কেমন-কেমন লাগল। তারপর কলকাতায় ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথ বন্ধু-হিসেবে আমাদের বাসায় প্রায় প্রত্যহই আসতেন এবং প্রায় প্রত্যহই তাঁর স্বরচিত গান শুনতুম। তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীও সঙ্গে আসতেম। তিনি হারমোনিয়ামে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গত করতেন। মধ্যেমধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'অভিজ্ঞা'-নামে তাঁর এক ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তার তুল্য গান গাইতে আমি আর-কাউকে কখনো শুনিনি। যেমন তার গলা মিষ্টি, তেমনি তার গাইবার ধরণ ছিল অতি সরস। তার মুখের একটি হিন্দী গান, "ঠাঢ়ি রহো মেরে আঁখন আগে" (ছায়ানট) আজপর্যন্ত আমার কানে লেগে আছে। তার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, সে সমস্ত 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গান প্রথম থেকে শেষপর্য্যন্ত একজায়গায় বসে একটানা গাইতে পারত – অভিনয় করে। এমন দরদী গলা লাখে একজনের হয়। মেয়েটি অল্পবয়সে মারা যায়, তাই তাকে বেশি লোকে জানতে পারেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার গানের অতিশয় ভক্ত ছিলেন।

এইসময় যদিও আমি সুর-সারের জগতেই থাকতুম, তবু পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ লালচাঁদের সঙ্গে একটি ওস্তাদের কাছে গান শিখতে যেতুম। তার কাছে একটিমাত্র ইমন-কল্যাণের খেয়াল শিখি। আমার রীতিমতো সঙ্গীত-শিক্ষা ঐপর্য্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার ৪।৫ মাস পরে তাঁর ভাতুষ্পুত্রী ও অভিজ্ঞার বড়দিদি শ্রীমতী প্রতিভাদেবীর সঙ্গে দাদার বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন একরকম হাফ-ওস্তাদ। এবং নিত্য গান অভ্যাস করতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বেশিরভাগ গাইতেন হিন্দীগান। তিনি পিয়ানোর সঙ্গে গান গাওয়া অভ্যাস করেছিলেন, তাই তাঁর গাবার ঢঙ ছিল একটু কাটা-কাটা। মীড় তাঁর গলায় ছিল না। তিনি কখনো রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন বলে' আমার মনে পড়ে না। কিন্তু সঙ্গীত-শিক্ষায় তাঁর অধ্যবসায় ছিল অসাধারণ। তিনি পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদি বিলিতীবাজনা। বেঠোভেনের Funeral March ও Moonlight Sonata আমি অন্ততঃ হাজারবার শুনেছি। তাইথেকে আমার বিলিতী গানবাজনার উপর যে-অশ্রদ্ধা ছিল, তা' কমে যায়।

কৃষ্ণনগরের সত্যলাহিড়ী যখন কলকাতায় আসতেন, তিনি আমাদের বাসাতেই ৪।৫ দিন থাকতেন। তাঁ'তে-আমাতে খুঁজতে-খুঁজতে বদ্রিসুকুলকে আবিষ্কার করলাম শ্যামক্ষেত্রী-নামক জনৈক হিন্দুস্তানী যুবকের বাসায় ; আর তাঁকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলুম। তিনি এসে সেতারে একটি ভৈরবীর সুর বাজালেন ; সে-বাজনা শুনে আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে' জল পড়তে লাগ্‌ল। বৌঠানও তাঁর বাজনা শুনে মুগ্ধ হলেন। তারপর তিনি বৌঠানের একজন সঙ্গীত-শিক্ষক-হিসেবে নিযুক্ত হলেন, - সেতারের নয়, গানের। পরে শুনেছি, বদ্রিসুকুল যোড়াসাঁকোয় আমার ভবিষ্যত শ্বশুরপরিবারেও গান ও সেতার কিছুদিন শিখিয়েছিলেন। তারপর জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখুয্যে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় বেকার বসেছিলেন এবং গানবাজনার একটি আড্ডা নিজের বাড়ীতে বসিয়েছিলেন। সে আড্ডায় আমি তাঁর সেতার ও সুরবাহার শুনতে প্রায়ই যেতুম। এবং সেখানে নগেন্দ্র ভট্‌চায-নামক একটি কথকের গান শুনতুম। তিনি হিন্দীগান খুব সুন্দর গাইতেন।

এই হচ্ছে আমার সঙ্গীতপ্রিয়তার পূর্ব্ব-ইতিহাস। তারপরেও এম,এ পাশ করবার পর বিশ্বনাথ-নামক এক হিন্দুস্থানী ওস্তাদের কাছে কিছুদিন গান শিখি। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি আমাকে একটি কেদারা ও একটি ইমন-কল্যাণ শেখান। কিন্তু সে-দুটি গানের একবর্ণও আমার মনে নেই।

এরপর ১৮৯৩ খৃঃ-এ আমি বিলেত চলে যাই। তিনবৎসর ফিরে এসে যতদিন বিয়ে করিনি ততদিন নানা নাচগানের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকতুম। ১৮৯৯ শালে আমার বিবাহ হবার পর এ-সব অভ্যাস ছেড়ে দিলুম। এইখানে আমি বলতে চাই-যে, বিলেত থেকে ফিরে-আসবার পর আমি রবীন্দ্রনাথের নব-পর্য্যায়ের গানের রসগ্রহণ করতে সমর্থ হই। কারণ, বুঝতে পারি যে, সে-সব গানের সুর ক্লাসিকাল রাগরাগিনী থেকেই উদ্ভুত। এবং তার ২।৪টি গান আমি নিজেও গাইতে পারতুম,- যথা "আহা জাগি পোহালো বিভাবরী" (ভৈঁরো), ও "তুমি যেয়োনা এখনি" (ভৈরবী)। তারপর বর্ষামঙ্গলের কয়েকটি গান, যথা "বাদল মেঘে মাদল বাজে", "তিমির অবগুণ্ঠনে", "যেতে যেতে একলা পথে"- এগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। এগুলি সবই গুরুগম্ভীর গান, যার সঙ্গে মৃদঙ্গের সঙ্গত করা চলে। আমি রবীন্দ্রনাথের বাউলের গানসম্বন্ধে কিছু বল্লুম না, কারণ সকলেই জানে, সেগুলি স্বদেশীযুগে দেশের লোককে পাগল করে দিয়েছিল।

এই সব অভিজ্ঞতার ফলেই আমি মধ্যেমধ্যে সঙ্গীতসম্বন্ধে কিছুকিঞ্চিৎ লিখি।

রবীন্দ্রবাবুর সনেট

কবিতা

হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট
কি সরস! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত-বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে!

আধেক নগন তনু বাকল-ভূষণে,
মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরী;
সলিলে কাঁপিছে শশী; চঞ্চল নয়নে
কাঁপে তারা, কাঁপে উরু গুরু গুরু করি!

নব বলয়িতা লতা বালিকা যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে,
লাজে বাধ বাধ বাণী, রূপের আলসে
ঢল-ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন!

পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে!

দেবেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র চিরঞ্জীবেষু

কবিতা

জনম-দিবস আজি তোমার।
ধর উপহার বড় দাদার।।
বিশ্বভারতী ভারতপ্রাণা
নানা দেশে ধরি মূরতি নানা,
প্রকাশিল লীলা অতি অপূর্ব।
কবি যবে দিলা গীত অনজলি
বলিলা জননী স্নেহরসে গলি
"কত আমি বিদেশে ঘুর্‌ব!
"এসেছিস তুই শুভ মুহুরতে
নিয়ে চল্ মোরে পুণ্য ভারতে,
শান্তি-সদন সেই আমার।"
নেপথ্যে।। বহুকালের প্রাচীন বৃদ্ধ।।
সেই বালকটি সেদিনকার
পঞ্চষষ্টি হইল পার,
কাণ্ড একি চমৎকার!
পঠদ্দশায় নাবালক বৃদ্ধ।। চমৎকার না চমৎকার।।
শুভকামী দ্বিজ।। নবারুণ-রথীকে নিয়ে রবি
দীপতিমান
বর্ষে বর্ষে এম্‌নি দিনে করিবে যবে ধেয়ান
তৎসবিতৃ দেবতার বরণীয় ভর্গ,
শান্তিনিকেতন হবে পৃথিবীর স্বর্গ।।
সত্যজ্যোতি বিনা হায় আঁধার পৃথিবী।
আঁধারের আলো রবি হোক চিরজীবী।।

কবিগুরু সম্বন্ধে
এ কবিতাটি লিখেন
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

কবিতা

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি;
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে,
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস-
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির লালিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।।

কবিগুরু সম্বন্ধে
এ কবিতাটি লিখেন
সুকান্ত ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা

কনককুসুম-বনে জীবন প্রকাশ।
নয়ন খুলিতে দেখ রূপের বিভাস।।
রূপের কোলেতে হ'ল লালন-পালন।
সাক্ষাৎ সৌন্দর্য সব আত্মীয়-স্বজন।।
সৌন্দর্য-আধার শিশু-সখা-সঙ্গী-সখী-মেলা।
সুন্দর সাজান ঘরে সুখে বাল্যখেলা।।
কর্কশ কঠোর গুরু নাহি দিল দীক্ষা।
লীলায়-খেলায় শুরু হ'ল চারুশিক্ষা।।
ফুলে বাস বাসে শ্বাস মেলা মালিগিরি।
মানসে কবিতা-ফুল ফোটে ধীরি ধীরি।।
দেবেন্দ্র মন্দিরমাত্র এ মহানগরে।
মাধুরী হেরিতে জানে পূজার আদরে।।
সুষমা-প্রতিমা সব হৃদি সুধাধার।
সৌন্দর্য মনেতে নাহি পশুর ব্যাভার।।
বিনাইতে জানে কেশ বানাইতে বেশ।
সুচিত্র সাজিতে জানে সাজাতে সরেশ।।
সুকণ্ঠ দেছেন বিধি সুচারু শ্রবণ।
ভাষায় মাধুরী ভাষে গীতে আলাপন।।
কবিতা সবিতা শিশু আলো করে মন।
প্রেমের জাহ্নবী বহে জড়াতে জীবন।।
বাণীর কমলবনে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।
মধুপান চিরদিন কুসুমে বিচারি।।
যেদিকে ফিরাও আঁখি সুষমার ছবি।
তবে রবি কেন নাহি হবে প্রেম কবি।।

কবিগুরু সম্বন্ধে
এ কবিতাটি লিখেন
অমৃতলাল বসু

চিঠি

রাশিয়ার চিঠি

মস্কৌ রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর-এক দল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না; কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্যে তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীরমনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষাস্বাস্থ্য-সুখসুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি, অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।

ভেবে দেখো-না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড্ পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলণ্ড্কে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড্ বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে, অতএব এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে—তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত, এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু এক-শো বছর হয়ে গেল; না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনো বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে; সায়েন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে ভালো ভালো অপেরা ও বড়ো বড়ো নাটকের অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই, ইংলণ্ডের মজুরে শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশপাতাল তফাত দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরাযদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারি উপকার হত।

প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি, কী হয়েছে আর কী হতে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বর্‌স্‌ এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে–তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে–আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ! কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল–এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুত বেগে বদলে গেছে–আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলি নে; গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে–কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না–সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে। এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্মের ভার দেওয়া হয়েছে দেখলুম, ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানারকম তদারকের দায়িত্ব নেয়; কর্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই-সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছি-কেবলই নিয়মাবলী রচনা হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েছে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ; অর্থাৎ হলে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই। আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই; নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই–কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয়, অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর–ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য; এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত বলেই কাজ এমন করে সহজে এগোয়। মাথা গুনতি করে আমাদের দেশের কর্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়, তারা পুরো একখানা মানুষ নয়।

ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

চিঠি

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা ‘পুনা’ স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারিদিকের লোকের কোলাহল সইতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছিনে, আমার মনটা বড়োই কেমন নির্জীব, অবসন্ন, ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হোক্ গে-ও-সব করুণরসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখলেও হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য থাকবে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। ‘সমুদ্রপীড়া’ কাকে বলে অবিশ্যি জানো কিন্তু কী রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পড়েছিলেম, সে-কথা বিস্তারিত করে লিখলে পাষাণেরও চোখে জল আসবে। ছটা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠি নি। যে ঘরে থাকতেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোটো, পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারদিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর করে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথার ভিতর যা-কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করে দিলে, চোখে দেখতে পাই নে, পা চলে না, সর্বাঙ্গ টলমল করে! দু-পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের ডেক-এ অর্থাৎ হাতে নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে; যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে—সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য।

সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেম না। মাথা ঘুরতে লাগল। ধরধরি করে আবার আমার ক্যাবিনে এলেম। সেই যে বিছানায় পড়লেম, ছ-দিন আর এক মুহূর্তের জন্যও মাথা তুলি নি। আমাদের যে স্টুঅর্ড ছিল (যাত্রীদের সেবক)–কারণ জানি নে–আমার উপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; না খেলে কোনোমতেই ছাড়ত না। সে বলত, না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব (weak as a rat)। সে বলত, সে আমার জন্যে সব কাজ করতে পারে। আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আসবার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ-দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হল। সেদিন আমার স্টুঅর্ড এসে নড়ে চড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে তো উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। মাথা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালো রকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মতো শরীরটা যেন আমার ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দুপুরবেলা দেখি একটা ছোটো নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চলেছে। চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত আর ডাঙা নেই, জাহাজসুদ্ধ লোক অবাক। তারা আমাদের স্টীমারকে ডাকতে আরম্ভ করলে, জাহাজ থামল। তারা একটি ছোটো নৌকায় করে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরবদেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্ছে। পথের মধ্যে দিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্ দিকে ও কত দূরে মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে, তারা আবার চলতে লাগল। সে নৌকো যে মস্কট পর্যন্ত পৌঁছবে তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল। ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড়-পর্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত, সূর্য সবেমাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কী বলব। পর্বতের উপর রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে, মনে হয় যেন অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আয়নার মতো পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোটা ছোটো পাল তোলা নৌকোগুলি আবার কেমন ছবির মতো দেখাচ্ছে।

এডেনে পৌঁছে বাড়ীতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেম কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি যে এই ক-দিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উল্‌টোপাল্‌টা হয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে। কী করে লিখব, ভালো মনে আসছে না। ভাবগুলো যেন মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। কিসের পর কী লিখব, তার একটা ভালোরকম বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। এই অবস্থায় লিখতে আরম্ভ করলেম, এমন বিপদে পড়ে তোমাকে যে লিখতে পারি নি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নেই।

দেখো, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম, তখন দেখতেম দূরদিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, এক বার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি, ও দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবার উথলে উঠবে। ঐ দিগন্তের পরে যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত; তখন মনে হত না, ঐ দিগন্তের পরে আর-এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে কেমন তৃপ্ত হয় না। কিন্তু দেখো, এ কথা বড়ো গোপনে রাখা উচিত; বাল্মীকি থেকে বায়রন পর্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে উঠবে; গ্যালিলিওর সময়ে এ-কথা বললে হয়তো আমাকে কয়েদ যেতে হত। এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ করেছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়ো একটা গায়ে লাগবে না। যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন বোধ করি সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠলেই আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পড়ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পড়ল। আমি স্বভাবতই 'লেডি' জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে লেডিদের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন।

এক তো মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা–তা ছাড়া সর্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু লেডি তাঁদের আদবকায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাই, পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগির মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি–এইরকম সাত-পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাকতেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেন্টলম্যানেরা সর্বদা খুঁত খুঁত করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী এক জনও ছিল না।

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। ব–মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিতামাশা করে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা করে, মেজে ঘষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য বুঝে হিসাব করে কথা কন না, মেপে জুকে হাসেন না ও দু-দিক বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার ভালো লাগত। কত প্রকার যে ছেলেমানুষি করেন তার ঠিক নেই। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখলে আমার বড়ো ভালো লাগে। আমাকে তিনি 'অবতার' বলতেন, গ্রেগরি সাহেবকে 'গড়গড়ি' বলতেন, আর-এক যাত্রীকে 'রুহি মৎস্য' বলে ডাকতেন; সেবেচারির অপরাধ কী তা জান? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বললেও হয়। এই জন্যে ব–মহাশয় তাকে মৎস্যশ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আমি যে কেন অবতারশ্রেণীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দেশ করা যায় না।

আমাদর জাহাজের T–মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতম ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনি নি। তিনি কথা কইতেন না, বক্তৃতা দিতেন। একদিন আমরা দু-চার জনে মিলে জাহাজের ছাতে দু-দণ্ড আমোদপ্রমোদ করছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব–মহাশয় তাঁকে বললেন, 'কেমন সুন্দর তারা উঠেছে'। এই আমাদের ফিলজফর তারার সঙ্গে মানুষ্য-জীবনের সঙ্গে একটা গভীর সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেম–আমরা "মূর্খেতে চাহিয়া থাকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া" রইলেম।

আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জনবুল ছিলেন। তাঁর তালবৃক্ষের মতো শরীর, ঝাঁটার মতো গোঁফ, শজারুর কাঁটার মতো চুল, হাঁড়ির মতো মুখ, মাছের চোখের মতো ম্যাডমেড়ে চোখ, তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন করত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সরে যেতেম। এক-এক জন কোনো অপরাধ না করলেও তার মুখশ্রী যেন সর্বদা অপরাধ করতে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুনতে পেতেম তিনি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকরবাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন, ও দশ দিকে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে কখনো হাসতে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হয়ে বসে আছেন। কোনো কোনো দিন ডেক-এ বেড়াতে আসতেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপাকটাক্ষে নেত্রপাত করতেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মতো মনে করতেন। প্রত্যহ খাবার সময় ঠিক আমার পাশে B–বসতেন। তিনি একটি ইয়ুরাশীয়। কিন্তু তিনি ইংরেজের মতো শিস দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়োই অনুগ্রহের চোখে দেখতেন। একদিন এসে মহাগম্ভীর স্বরে বললেন, "ইয়ং ম্যান্, তুমি অক্সফোর্ড যাচ্ছ? অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি বড়ো ভালো বিদ্যালয়।" আমি একদিন ট্রেঞ্চ সাহেবের "Proverbs and Their Lessons" বইখানি পড়ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিস দিতে দিতে দু-চার পাত উলটিয়ে পালটিয়ে বললেন, "হাঁ, ভালো বই বটে।" ট্রেঞ্চের শুভাদৃষ্ট! আমার উপর তাঁর কিছু মুরব্বিয়ানা ব্যবহার ছিল।

এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিসি-পথ দিয়ে ইংলণ্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলওয়ের গাড়িতে উঠে আলেকজান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা স্টীমার অপেক্ষা করে–সেই স্টীমারে চচড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌঁছতে হয়। আমরা overland-পেরোনো যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাবতে হল। আমরা তিনজন বাঙালি ও একজন ইংরেজ একখানি আরব নৌকো ভাড়া করলেম। মানুষের "divine" মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাবতে পারে, তা সেই নৌকোর মাঝিটার মুখ দেখলে জানতে পারতে। তার চোখ দুটো যেন বাঘের মতো, কাল কুচকুচে রং, কপাল নিচু, ঠোঁট পুরু, সবসুদ্ধ মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকোর সঙ্গে দরে বনল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হল। ব–মহাশয় তো সে নৌকোয় বড়ো সহজে যেতে রাজি নন; তিনি বললেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই–ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই-একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প করলেন।

কিন্তু যা হক, আমরা সেই নৌকোয় তো উঠলেম। মাঝিরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কয়, ও অল্পস্বল্প ইংরেজি বুঝতে পারে। আমরা তো কতক দূর নির্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরেজ যাত্রীটির সুয়েজের পোস্ট আপিসে নাববার দরকার ছিল। পোস্ট আপিস অনেক দূর এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝি একটু আপত্তি করলে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে "পোস্ট আপিসে যেতে হবে কি? সে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব।"–আমাদের রুক্ষস্বভাব সাহেবটি মহা ক্ষাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "your grandmother"। এই তো আমাদের মাঝি রুখে উঠলেন, "what? mother? mother? What mother, don't say mother"। আমরা মনে করলুম সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলে ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা করলে, " what did say? (কী বললি?)" সাহেব তাঁর রোখ ছাড়ালেন না। আবার বললেন "your grandmother"। এই তো আর রক্ষা নেই, মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভালো নয় দেখে নরম হয়ে বললেন, "you don't seem to understand what I say!" অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরেজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল "বস–চুপ।" সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্যস্ফুর্তি হল না। আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "কত দূর বাকি আছে?" মাঝি অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "Two shilling give, ask what distance!" আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দু-শিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ-রাজ্যে এই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আইনে নেই! মাঝিটা যখন আমাদের এইরকম ধমক দিচ্ছে তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে, তারা তো পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে। মাঝিমহাশয়ের বিষম বদমেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠেছিল। একদিকে মাঝি ধমকাচ্ছে, একদিকে দাঁড়িগুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, মাঝিটির উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোনো উপায় না দেখে আমরাও তিনজনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম–এ রকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ শহরে গিয়ে তো পৌঁছলেম। সুয়েজ শহর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই, কারণ আমি সুয়েজের আধ মাইল জায়গার বেশি আর দেখি নি। শহরের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূর্বে সুয়েজ দেখেছিলেন, তাঁরা বললেন, "এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোনা ফললাভের সম্ভাবনা নেই।" তাতেও আমি নিরুৎসাহ হই নি কিন্তু শুনলেম গাধায় চড়ে বেড়ানো ছাড়া শহরে বেড়াবার আর কোনো উপায় নেই।

রোগগ্রস্ত চোখ থেকে ঐ রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুগ্ন চোখে গিয়ে বসে, চারিদিকে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সুয়েজে আমরা রেলগাড়িতে উঠলেম। এ রেলগাড়ির অনেকপ্রকার রোগ আছে, প্রথমত শোবার কোনো বন্দোবস্ত নেই, কেন না বসবার জায়গাগুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়ত এমন গজগামিনী রেলগাড়ি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠলেম তখন দেখলেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাষ করা যায়। এইরকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা আলেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দুধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুয়ো। মাঝে মাঝে দুই-একটা কোঠাবাড়ি—বাড়িগুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্তটাই দেয়ালের মতো, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই-একটা জানলা। এই সকল কারণে বাড়িগুলোর যেন শ্রী নেই। যা হোক আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে রকম অনুর্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম, চারদিক দেখে তা কিছুই মনে হল না। বরং চার দিককার সেই হরিৎ ক্ষেত্রের উপর খেজুরকুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্য 'মঙ্গোলিয়া' স্টীমার অপেক্ষা করছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম। আমার একটু শীত-শীত করতে লাগল। জাহাজে গিয়ে খুব ভাল করে স্নান করলেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধুলো প্রবেশ করেছিল। স্নান করার পর আলেকজান্দ্রিয়া শহর দেখতে গেলেম। জাহাজ থেকে ভাঙা পর্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকো ভাড়া হল। এখানকার এক-একটা মাঝি সার উইলিম জোন্‌সের দ্বিতীয় সংস্কণর বললেই হয়। তারা গ্রীক, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে। শুনলেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তাঘাটের নাম, সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়, অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা। আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকানবাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো, তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড়ো বেশি রকম হয়। খুব বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো দোকান, শহরটি খুব জমকালো বটে। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। বিস্তর জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। য়ুরোপীয়, মুসলমান, সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার-পাঁচ দিনে আমরা ইটালিতে গিয়ে পৌঁছলেম, তখন রাত্রি একটা-দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ করে, জিনিসপত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠলেম। জ্যোৎস্নারাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড়ো একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত করছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ শহর, বাড়িগুলির জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ–সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পড়ে গেল, কখনো শুনি ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাকব কি বেরোব কিছুই স্থির নেই। একজন ইটালিয়ান অফিসার এসে আমাদের গুনতে আরম্ভ করলে–কিন্তু কেন গুনতে আরম্ভ করলে তা ভেবে পাওয়া গেল না। জাহাজের মধ্যে এইরকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হল যে, এই গণনার সঙ্গে আমাদের ট্রেনে চড়ার একটা বিশেষ যোগ আছ। কিন্তু সে-রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে সে-রাত্রে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হল।

এই তো প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। কোনো নূতন দেশে আসবার আগে আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বলে মনেই হয় না। য়ুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি শুনে সকলেই অবাক।

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিসির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। সকালে একটা আধমরা ঘোড়া ও আধভাঙা গাড়ি চড়ে শহর দেখতে বের হলেম। সারথির সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলব! সারথির বয়স চোদ্দো হবে–কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে–আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হল। ছোটোখাটো শহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিন্দিসিও তাই। কতকগুলি কোঠাবাড়ি, দোকানবাজার, রাস্তাঘাট আছে। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করে ফিরছে, দু-চার জন লোক মদের দোকানে বসে গল্পগুজব করছে, দু-চার জন রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে হাসিতামাশা করছে; লোকজনেরা অতি নিশ্চিন্তমুখে গজেন্দ্রগমনে গমন করছে; যেন কারও কোনো কাজ নেই, কারও কোনো ভাবনা নেই–যেন শহরসুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার সমারোহ নেই, লোকজনের সমাগম নেই। আমরা খানিক দূর যেতেই এক জন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল। ব–মহাশয় বললেন, “বিনা আয়াসে এর কিছু রোজগার করবার বাসনা আছে।”

লোকটা এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগল, "ঐটে চার্চ, ঐটে বাগান, ঐটে বাগন, ঐটে মাঠ" ইত্যাদি। তার টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হয় নি, আর তারটীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হত না। তাকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠতে বলে নি, কেউ তাকে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য তার যাচ্ঞা পূর্ণ করতে হল। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার ফলের গাছ, তার সংখ্যা নেই। চারিদিকে থোলো থোলো আঙুর ফলে রয়েছে। দু-রকম আঙুর আছে, কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালোগুলিই আমার বেশি মিষ্টি লাগল। বড়ো বড়ো গাছে আপেল পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে। একজন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যানপালিকা) কতকগুলি ফলমূল নিয়ে উপস্থিত করলে। আমরা সেদিকে নজর করলেম না; কিন্তু ফল বিক্রয় করবার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্তত বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হল, তখন আর অগ্রাহ্য করবার সাধ্য রইল না। ইটালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন চমৎকার।

তিনটের ট্রেনে বৃন্দিসি ছাড়লেম। রেলোয়ে পথের দু-ধারে আঙুরের খেত, চমৎকার দেখতে। পর্বত, নদী, হ্রদ, কুটির, শস্যক্ষেত্র, ছোটো ছোটো গ্রাম প্রভৃতি। যত কিছু কবির স্বপ্নের ধন সমস্ত চারদিকে শোভা পাচ্ছে। গাছপালার মধ্যে থেকে যখন কোনো একটি দূরস্থ নগর, তার প্রাসাদচূড়া, তার চার্চের শিখর, তার ছবির মতো বাড়িগুলো আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড়ো ভালো লাগে। সন্ধ্যেবেলায় একটি পাহাড়ের নিচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আর আমি ভুলতে পারব না, তার চারি দিকে গাছপালা, জলে সন্ধ্যার ছায়া সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা করতে চাই নে।

রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা Mont Cenis-এর বিখ্যাত সুরঙ্গ দেখলেম। এই পর্বতের এ-পাশ থেকে ফরাসিরা ও-পাশ থেকে ইটালিয়নরা, এক সঙ্গে খুদতে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সুমুখাসুমুখি হয়। এই গুহা অতিক্রম করতে রেলগাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিনরাত আলো জ্বালাই আছে, কেন না এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা পর্বতগুহা ভেদ করতে হয়—সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালি থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা—নির্ঝর নদী পর্বত গ্রাম হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম।

সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কী জমকালো শহর। অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরীব লোক নেই। মনে হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কী আবশ্যক। হোটেলে গেলেম, এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলেও বোধ করি তেমনি অসোয়াস্তি হয়। সমরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা 'টার্কিশ-বাথে' গেলেম। প্রথমত একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বসলেম, সে-ঘরে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে কারো কারো ঘাম বেরতে লাগল, কিন্তু আমার তো বেরল না, আমাকে তার চেয়ে আর-একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে-ঘরটা আগুনের মতো, চোখ মেলে থাকলে চোখ জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাকতে পারলেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে খুব ঘাম হতে লাগল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংসপেশল চমৎকার শরীর কখনো দেখি নি। "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।" মনে মনে ভাবলেম ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বললে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে, এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব; আধ ঘণ্টা ধরে সে আমার সর্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন করলে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি, শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। যথেষ্টরূপে দলিত করে আমাকে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ করে পরিষ্কার করলে। পরিষ্করণ-পর্ব শেষ হলে আর-একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড়ো পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল, হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করতে লাগল; এইরকম কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম, তার উপর থেকে নিচে থেকে চার পাশ থেকে বাণের মতো জল গায়ে বিঁধতে থাকে। সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্যন্ত যেন জমাট হয়ে গেল—রণে ভঙ্গ দিতে হল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মতো আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে। আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন। তাঁর সাঁতার দেওয়া

তার পরে সমস্ত দিনের জন্যে এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস এক্‌সিবিশন দেখতে গেলেম। তুমি এইবার হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া করেছ, ভাবছ আমি প্যারিস এক্‌সিবিশনের বিষয় কী জানি বর্ণনা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী বলব, কলকাতার য়ুনিভার্সিটিতে বিদ্যা শেখার মতো প্যারিস এক্‌সিবিশনের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভালো করে দেখি নি। একদিনের বেশি আমাদের প্যারিসে থাকা হল না—সে বৃহৎ কাণ্ড একদিনে দেখা কারও সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখলেম-কিন্তু সে-রকম দেখায়, দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল কিন্তু দেখা হল না। সে একটা নগরবিশেষ। এক মাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম। প্যারিস এক্‌সিবিশনের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণত মনে আছে যে চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি, স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি, নানা দেশবিদেশের নানা জিনিস দেখেছি; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেম—এমন বিষণ্ন অন্ধকার-পুরী আর কখনো দেখি নি—ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্তসমস্ত ভাব। আমি দুই-এক ঘণ্টামাত্র লণ্ডনে ছিলেম, যখন লণ্ডন পরিত্যাগ করলেম তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ করে বাঁচলেম। আমার বন্ধুরা আমাকে বললেন, লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালোবাসা হয় না, কিছু দিন থেকে তাকে ভালো করে চিনলে তবে লণ্ডনের মাধুর্য বোঝা যায়।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময়নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়াছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন-প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক, তখন আমি চোদ্দয় পা দিয়েছি। খন্ড খন্ড পদাবলীর প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক্ থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তারা তা লক্ষ্য করতেন না। পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত আমার কৌতুহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি। যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামত মানে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত। তার পরের সোপানে ওঠা গেল পদাবলীর জালিয়াতিতে। অক্ষয়বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল করার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিল না যে, ঠিকমত নকল করতে হলেও শুধু ভাষায় নয়, ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পরে।

পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সাথে বহন করে এসেছি। একে সাহিত্যের একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি। প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা স্লেটের উপরে, অন্তপুরের কোণের ঘরে--

গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে।

মনে বিশ্বাস হল চ্যাটার্টনের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না। এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।
শান্তিনিকেতন

১১|৭|৪০

পদাবলী

বসন্ত আওল রে

বসন্ত আওল রে !
মধুকর গুন গুন , অমুয়ামঞ্জরী
কানন ছাওল রে ।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল ,
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূর দূর চলি গেল ।
মরমে বহই বসন্তসমীরণ ,
মরমে ফুটই ফুল ,
মরমকুঞ্জ'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল ।
সখি রে উছসত প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ ,
নিখিল জগত জনু হরখ - ভোর ভই
গায় রভসরসগান ।
বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে দুখিনী রাধা ,
কঁহি রে সো প্রিয় , কঁহি সো প্রিয়তম ,
হৃদিবসন্ত সো মাধা ?
ভানু কহত অতি গহন রয়ন অব ,
বসন্তসমীর শ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্তকুঞ্জতল

ফুল্ল বাসনা - বাসে ।

পদাবলী

সজনি সজনি রাধিকা লো

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহু চাহিয়া ,
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া ।
পিনহ ঝটিত কুসুমহার ,
পিনহ নীল আঙিয়া ।
সুন্দরি সিন্দূর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া ।
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলন - গীতি গাও রে ,
চঞ্চল মঞ্জীর - রাব
কুঞ্জগগন ছাও রে ।
সজনি অব উজার মঁদির
কনকদীপ জ্বালিয়া ,
সুরভি করহ কুঞ্জভবন
গন্ধসলিল ঢালিয়া ।
মল্লিকা চমেলী বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা ,
গাঁথ যূথি , গাঁথ জাতি ,
গাঁথ বকুল - মালিকা ।
তৃষিতনয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জপথম চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে ,
মৃদুল গান গাহিয়া ।

পদাবলী

বঁধুয়া, হিয়া ’পর আও রে

বঁধুয়া , হিয়া'পর আও রে ,
মিঠি মিঠি হাসয়ি , মৃদু মধু ভাষয়ি ,
হমার মুখ'পর চাও রে !
যুগযুগসম কত দিবস বহয়ি গল ,
শ্যাম তু আওলি না ,
চন্দ্র - উজর মধু - মধুর কুঞ্জ'পর
মুরলি বজাওলি না !
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে ,
লয়ি গলি নয়নআনন্দ !
শূন্য কুঞ্জবন , শূন্য হৃদয়মন ,
কঁহি তব ও মুখচন্দ ?
ইথি ছিল আকুল গোপনয়নজল ,
কথি ছিল ও তব হাসি ?
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট ,
কথি ছিল ও তব বাঁশি ;
তুঝ মুখ চাহয়ি শতযুগভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান ।
লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে
সকল মান - অভিমান ।
ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে
প্রেমক নাহিক ওর ।
হরখে পুলকিত জগত - চরাচর
ডুঁহুক প্রেমরস ভোর ।

পদাবলী

মাধব, না কহ আদরবাণী

মাধব , না কহ আদরবাণী ,
না কর প্রেমক নাম ।
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম ।
কপট , কাহ তুঁহু ঝূট বোলসি ,
পীরিত করসি তু মোয় ?
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নু ,
না পতিয়াব রে তোয় ।
ছিদল তরীসম কপট প্রেম'পর
ডারনু যব মনপ্রাণ ,
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে
অব কুত নাহিক ত্রাণ ।
মাধব , কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর ?
মাধব , কাহ তু মলিন করলি মুখ ,
ক্ষমহ গো কুবচন মোর !
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব ,
তুঁহু মম প্রাণক প্রাণ ।
অতিশয় নির্মম ব্যথিনু হিয়া তব
ছোড়য়ি কুবচনবাণ
মিটল মান অব – ভানু হাসতহি
হেরই পীরিতলীলা ।
কভু অভিমানিনী , আদরিণী কভু
পীরিতিসাগর বালা ।

টুকরো ছবিচিত্র.....

রবীঠাকুর কতিপয় মজলিস ছাত্রদের সাথে,
মজলিস, তেহরান, ১৯৩২.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

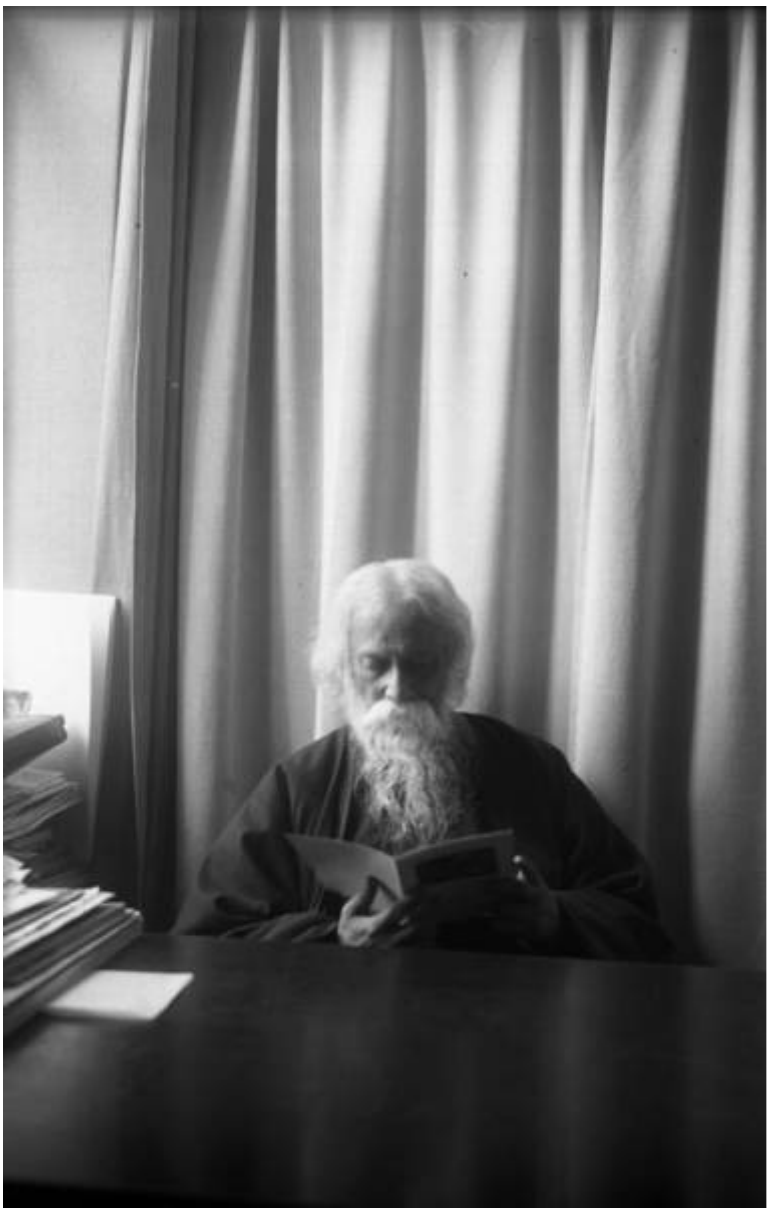

বার্লিনে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

পরিবারের সাথে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

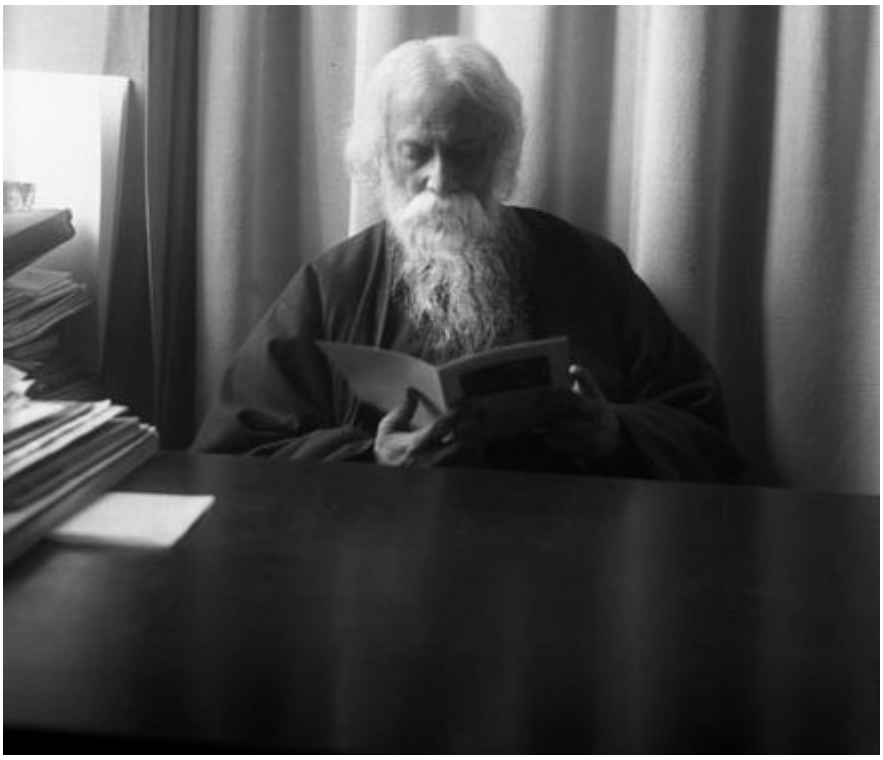

নিজ লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

রবীঠাকুর কতিপয় ছাত্রদের সাথে.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

লন্ডনে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

আইনস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

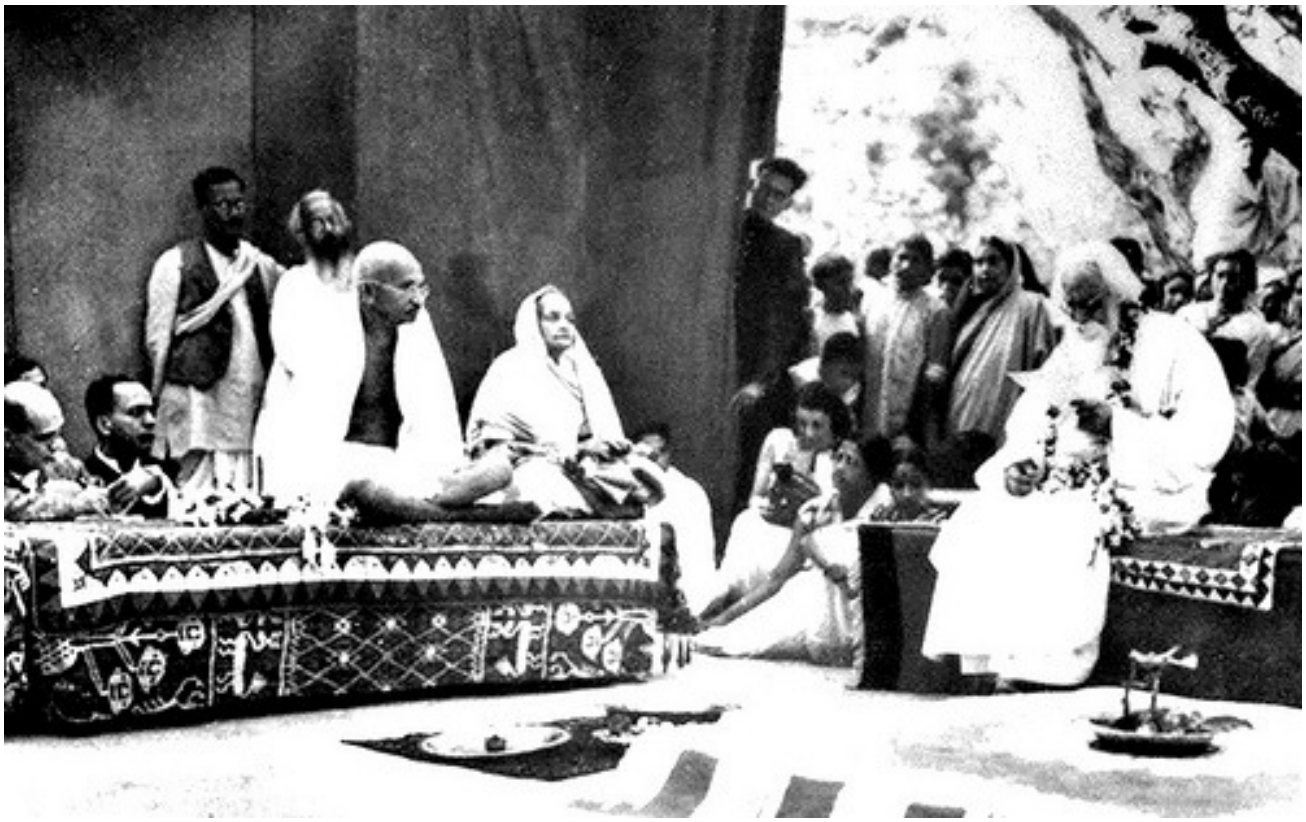

গান্ধিজীর সাথে শান্তিনিকেতনে.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

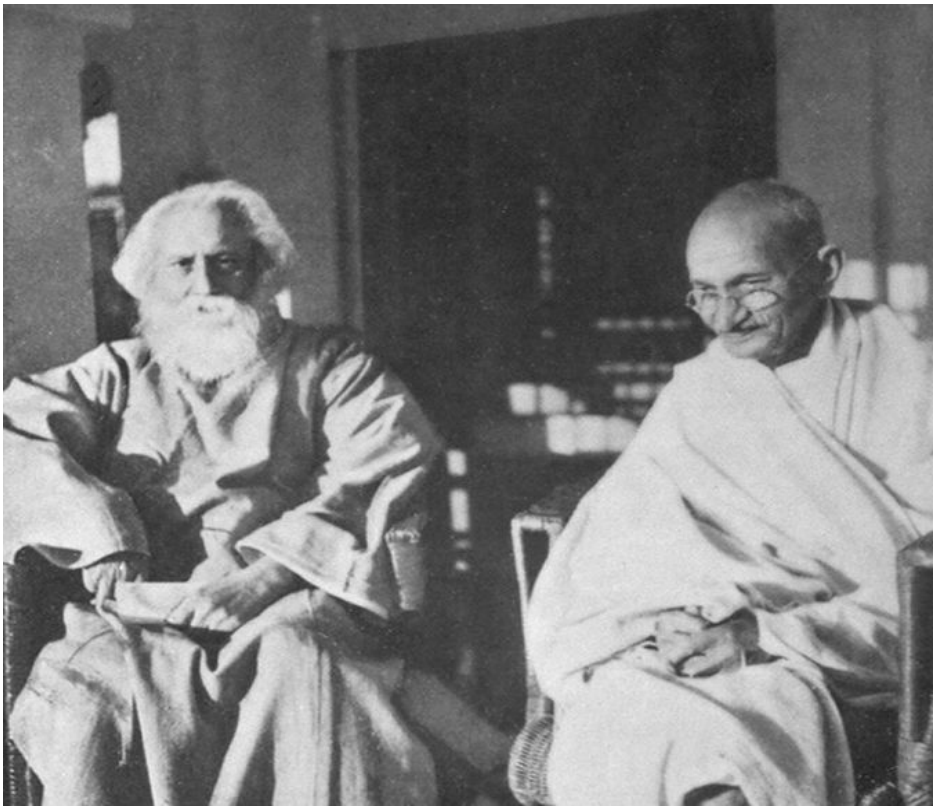

মাহাত্মা গান্ধরি সাথে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

নিজ বাসায় রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

স্ত্রীর সাথে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

গৃহভৃত্যর সাথে ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

এন্ড্রিউজ এবং রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

গান্ধিজী এবং রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথ.....

টুকরো ছবিচিত্র.....

ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথ.....

সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা

সকলেই কিছু নিজের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এইজন্যই ছাঁচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিছু কবি নহে, এই জন্য অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এইজন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ-রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে, যে, যখনি তাহার ফুলবাগানে বসন্তের বাতাস বয় তখনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধরে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুলবাগান নাই, যার প্রাণে বসন্তের বাতাস বয় না, সে কী করে? সে প্যাটার্ণ কিনিয়া চোখে চশমা দিয়া পশমের ফুল তৈরি করে।

আসল কথা এই, যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না।

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কি করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন। তিনি নিজেকেই কখন বা রামরূপে, কখন বা রাবণরূপে, কখন বা হ্যাম্‌লেটরূপে, কখন বা ম্যাক্‌বেথরূপে পরিণত করিতে পারেন– সুতরাং অবস্থাবিভেদে প্রকৃতিবিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন। আর যিনি গড়েন তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং তাঁর একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই-ইঁহাদের কেবল কেরাণিগিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ, আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থই তাহাই।

নকলনবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহ্য আকারের প্রতিই তাঁহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাঁহাদের চেনা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি সকলগুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণতঃ লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে ত কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান্ ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহণকালে দ্রৌপদী ও ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবদিগের জয় হইল তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায় যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এত দিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান্ আনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল তখনি সে উদ্যমের কার্য্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জ্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে। ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরো নামিয়া আসা যাক্, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে- কুন্দনন্দিনী ত এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল-মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল;- আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম-বাকীটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম-ইহাই ট্র্যাজেডি।

অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময় সেমিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে যান তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফরমাস্ দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে সুরু করেন। এপিক্ (epic) শব্দটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। এপিক্ বলিতে লোকে সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই তাহা আর এপিক্ হইবে কি করিয়া? আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক্ দেখিয়াছি তাহার প্রায় সবগুলিতেই যুদ্ধ আছে সত্য কিন্তু তাহাই বলিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা ভাল হয় না, যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া যদি কেহ এপিক্ লেখে তবে তাহাকে এপিক্ বলিব না! এপিক্ কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কি হইতে? কবিরা এপিক্ লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন "এস একটা এপিক্ লেখা যাক " বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক্ লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্যচরিত্রের উদার মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দ্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পূণ্যকিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিক্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য। মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনাকালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিস্‌ই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধবর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল-কেবলমাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্রপ্রবৃত্তি; আর রামায়ণে দেখ এক দিকে রামের সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, এক দিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসারত্যাগ।

রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে - যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধবর্ণনামাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে যাহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।

হেমবাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্য শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্ব্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ, আট-নয় সর্গ ধরিয়া, সাত-আট-শ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্ত্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্ব্বত্র চরিত্রবিকাশ, চরিত্রমহত্ত্ব দেখিতে চাই! মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে, কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে-একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহার শুভ্র তুষারললাটে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্ব্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ, যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্ত্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়? কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এত দূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং অধর্ম্মের ফলে বৃত্রের সর্ব্বনাশ – যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয় মাত্র, কখন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংস-ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয় গৌরব কীর্ত্তিত হয়- গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনায় কোন্ খানে সেই উদ্দীপনী মূলশক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই।

তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই সেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে! মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্য-সাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন-কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের কোন পাত্র আমাদের সুখদুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক হইতে পারেন না। কখনো কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই – চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে – যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধিভবনে শায়িত তখনো প্রতাপ চন্দ্রশেখর হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যেমন আমরা এই দৃশ্যমান জগতে বাস করিতেছি তেমনি আর একটি অদৃশ্য জগৎ অলক্ষিত ভাবে আমাদের চারি দিকে রহিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া বহুতর কবি মিলিয়া আমাদের সেই জগৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে আমি যেমন একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হইতাম, তেমনি আমি যদি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির কবিত্বজগতে না জন্মিয়া ভিন্নদেশীয় কবিত্বজগতে জন্মিতাম তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন; আমরা সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না- অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, জানিতেই পাই না। সেই-সকল অমর সহচর-সৃষ্টিই মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দ্দিকব্যাপী সেই কবিত্বজগতে মাইকেল কয় জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন্ লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর-একটা কথা বক্তব্য আছে- মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি কোন্ মহৎকল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন: I despise Ram and his rabble। সেটা বড় যশের কথা নহে - তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য-রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতিবহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুবজ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীতে কিরণ দান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কা বর্ষণ করিয়া, বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে।

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্যচরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর-এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন সেই আহ্বানসংগীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল। মাইকেল ভাবিলেন, মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন; অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ-নরক- বর্ণনা আছে; অমনি জোর-জবর্দস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস, এক স্বর্গ-নরক-বর্ণনার অবতারণ করিলেন। মাইকেল জানেন কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়; অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত তাহা তিনি করিয়াছেন।

একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাব্যের একটা কাঠাম প্রস্তুত করিয়া মহাকাব্য লিখিতে বসেন- যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া, সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্যরচনায় অগ্রসর হন- তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় অনন্যপূর্ব্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয় দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না।

আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না- আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।

হে বঙ্গমহাকবিগণ! লড়াই-বর্ণনা তোমাদের ভালো আসিবে না, লড়াই-বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙালিদের মানুষ হইতে শিখাও।

কথামৃত-

"আমার মহা সৌভাগ্য এই যে, আমার যৌবনের প্রারম্ভে আমি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাভ করি এবং তাঁর মানসিক আবহাওয়াতেই মানুষ হই। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই আমার প্রতি অনুকূল হন, আর এই দীর্ঘ জীবনে আমি তাঁর অনুগ্রহে কোনদিন বঞ্চিত হই নি। আমার অন্তরে একটি প্রচ্ছন্ন অহং ছিল এবং আছে, যা সহজে কারও বাগ মানে না। তিনি কায়মনোবাক্যে পরিচয় দিয়েছেন যে, তাঁর বিচিত্র জীবন হচ্ছে একটি জীবন্ত কাব্য, যা শতদলের মত ফুটে উঠেছে"।

--প্রমথ চৌধুরী

চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ.....

ষাট বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কণ শুরু করেন। চিত্রকলায় তাঁর কোন প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিল না। খেলার ছলেই তিনি আঁকতে শুরু করেছিলেন, তারপর একসময় তা'নেশায় পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, মুখমণ্ডল বা মুখাবয়বের ছবি ; দ্বিতীয়ত, অদ্ভুত কাল্পনিক প্রাণীর ছবি ; তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। এর বাইরেও ছবি আছে ; কিন্তু অধিকাংশ ছবি উল্লিখিত তিনটির যে কোন একটি ভাগে পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের আঁকা আত্মপ্রতিকৃতিও একাধিক। এমনকী "ফিমেইল ন্যুডও" তিনি এঁকেছেন। মুখাবয়ব বা মুখমণ্ডল আঁকার প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল। কোন কোন ছবিতে এমন কিছু বিষয়বস্তু আছে যা অভারতীয়,যেমন অপেরার মতো নাটকীয় দৃশ্য, খ্রিষ্টিয় নানের অবয়ব ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন অদ্ভুতভাবে ; তাঁর কাগজের মাপ ঠিক ছিল না ; ঠিক ছিল না রংয়ের। ভালো মানের সামগ্রী না-হওয়ায় বেশ কিছু ছবি অপুনরুদ্ধারণীয়ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। কখনো কলম, কখনো

পেন্সিল, কখনো তুলি এমনকী ওভারকোটের হাতায় রং মাখিয়ে পর্যন্ত এঁকেছেন। এভাবেই আড়াই হাজারেরও বেশি ছবি এঁকেছেন তিনি। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল : ফলে, মহৎ ছবি সৃষ্টির চেয়ে অংকনটি আদৌ ছবি হচ্ছে কি-না তাই নিয়ে তিনি সদা ভাবিত ছিলেন: "ছবিটা ছবি হলো কিনা" সেটাই দেখতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দক্ষিণ ফ্রান্সের একদল শিল্পীর উৎসাহে তিনি প্যারিসে প্রথম তাঁর ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এরপর সারা ইউরোপে সফলভাবে প্রদর্শিত হতে থাকে তাঁর চিত্রাবলি।[২৩] ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের পিগ্যাল আর্ট গ্যালারিতে তাঁর প্রথম শিল্প প্রদর্শনীর সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের ছবি আলোচনা ও সমালোচনার বিষয়বস্তু। কবিতা ও গানের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলতে পারেন নি, সেই অসৌন্দর্য, কিম্ভূত আর অসুরেরই প্রকাশ তাঁর চিত্রকলা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল নান্দনিকতার অত্যাশ্চর্য প্রদর্শনী ও বর্ণময়তা।

চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ.....

প্রিমিটিভ আর্টে যে পরিশীলনহীন প্রাকৃত শক্তি দেখা যায়, তাঁর ছবিতে সেই শক্তির স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায় ; দেখা যায় জ্যামিতিক আকার, কৌণিকতা, রঙের উগ্রতা। এডভার্ড মুঙ্খ বা এমিল্ নোলদের অংকনরীতিরও ছায়াসম্পাত আছে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছবিতে। অবশ্য কারো কারো মতে তাঁর ছবিতে প্রোটানোপিয়া (বর্ণান্ধতা) বা বিশেষ কিছু রঙের প্রতি (রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে লাল-সবুজ) অযথার্থ প্রয়োগের উদাহরণেরও দেখা মেলে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একাধিক শৈলী আয়ত্ত্ব করেছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তর নিউজিল্যান্ডের লোকশিল্প, কানাডার পশ্চিম উপকূলের (ব্রিটিশ কলম্বিয়া) হাইদা খোদাই চিত্রশিল্প, এবং ম্যাক্স পেচস্টেইনের কাঠখোদাই।[২৪] নিজের হস্তাক্ষরের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ শিল্পসচেতন ছিলেন। সাধারণ রেখাঙ্কণের সৌন্দর্যায়ণ, কাটাকুটি, সাধারণ ছন্দোময় নকশার মাধ্যমে পাণ্ডুলিপিতে শব্দগুলির শৈল্পিক উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি বহু অপূর্ব নকশাচিত্র অঙ্কণ করেন।

মানুষ যখন আমার ছবিগুলোর ব্যাখ্যা জানতে চায়, আমি তখন আমার ছবিগুলোর মতই নীরব থাকি। এটা করি তাদের নিজেদের অপ্রকাশিত সত্ত্বার প্রকাশের জন্য!

-- রবীঠাকুর

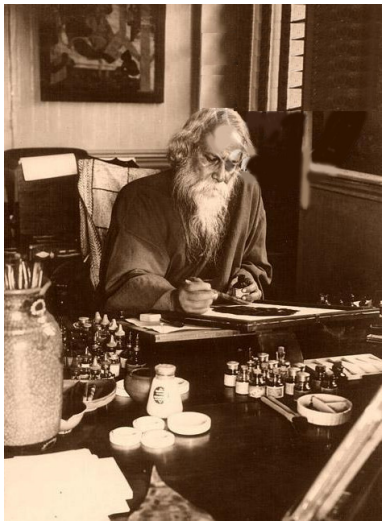

.....রবীন্দ্রনাথের ছবি আকাঁর ঘর!

রবীন্দ্রনাথের আঁকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবি

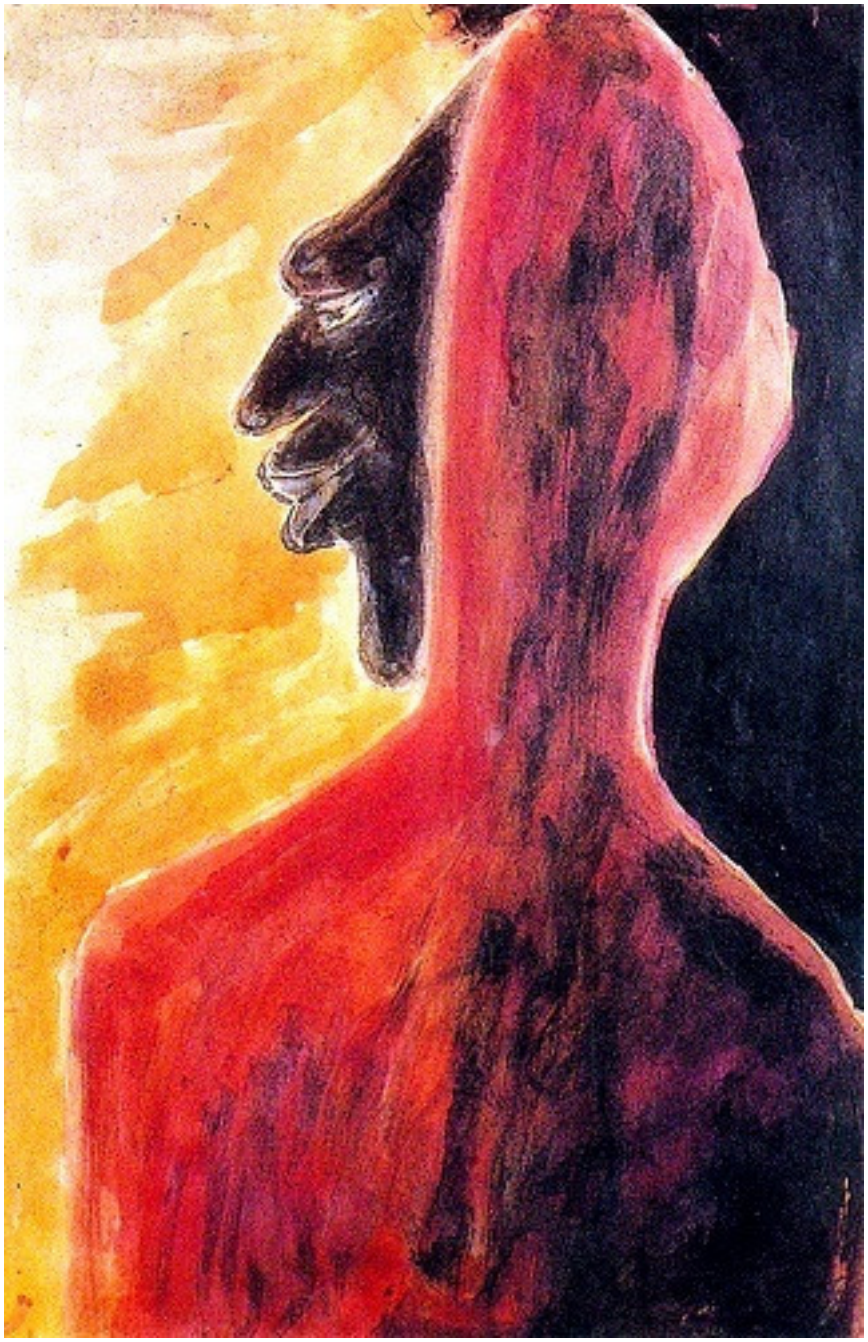

"নামহীন"
১৯২৮
মাধ্যম: জলরং

"নিসর্গ"

১৯৩৬

মাধ্যম: জলরং

"নর্তকী-২"

১৯২৮

মাধ্যম: জলরং

"পাখি"

১৯২৯

মাধ্যম: জলরং

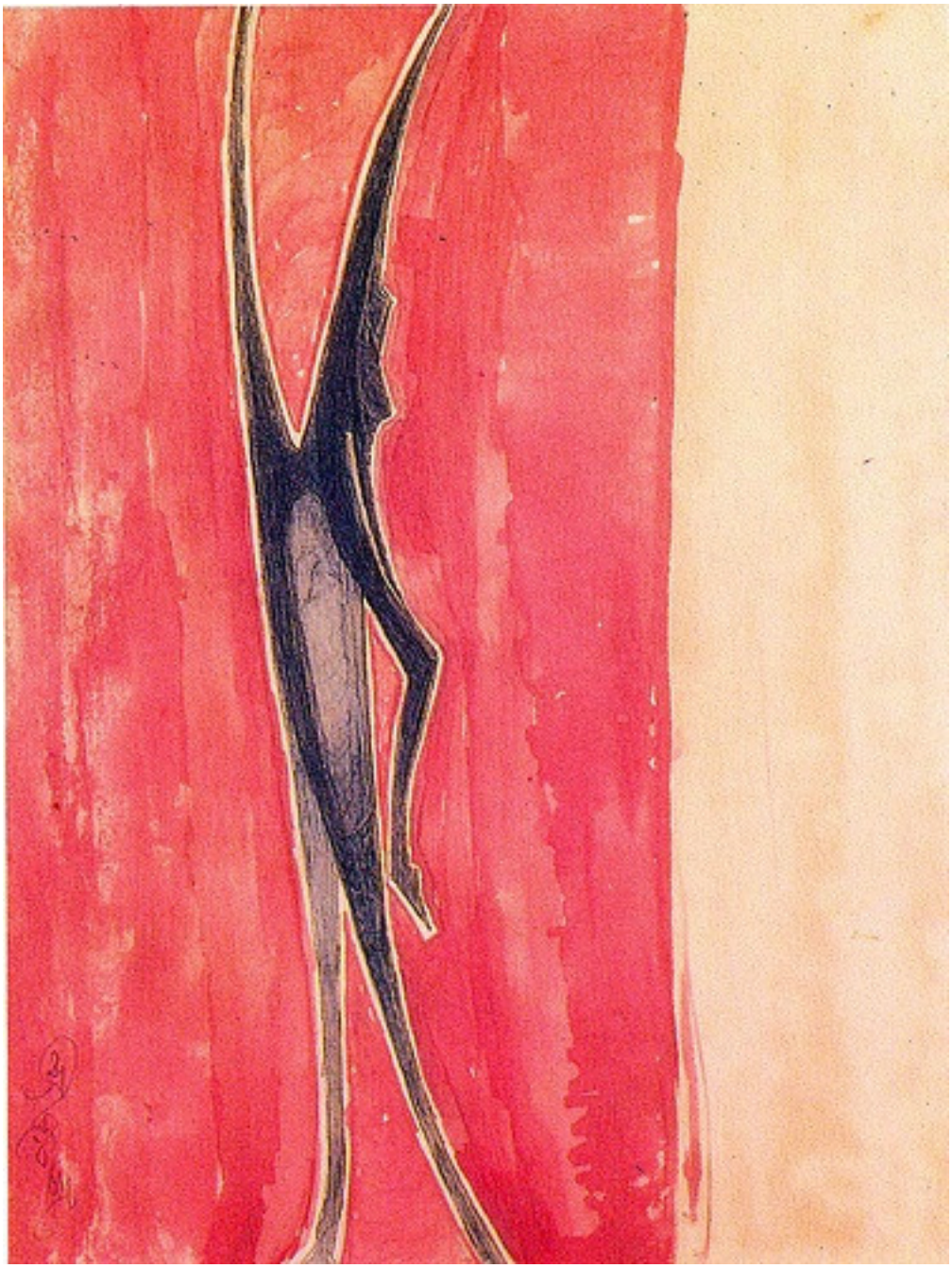

"নামহীন"
১৯২৮
মাধ্যম: জলরং

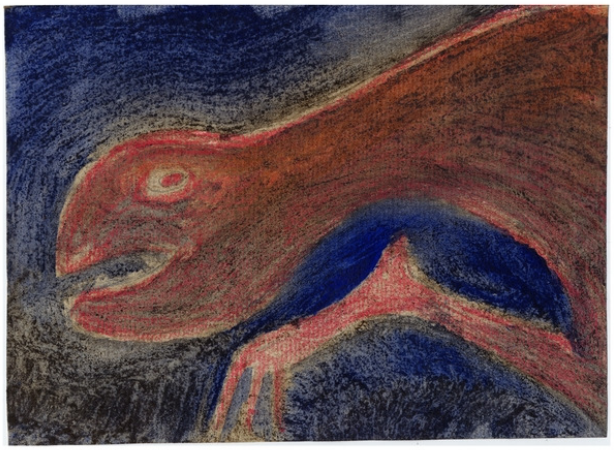

"নামহীন"

১৯২০

মাধ্যম: জলরং

"বধু"
১৯৩০
মাধ্যম: কালিকলম

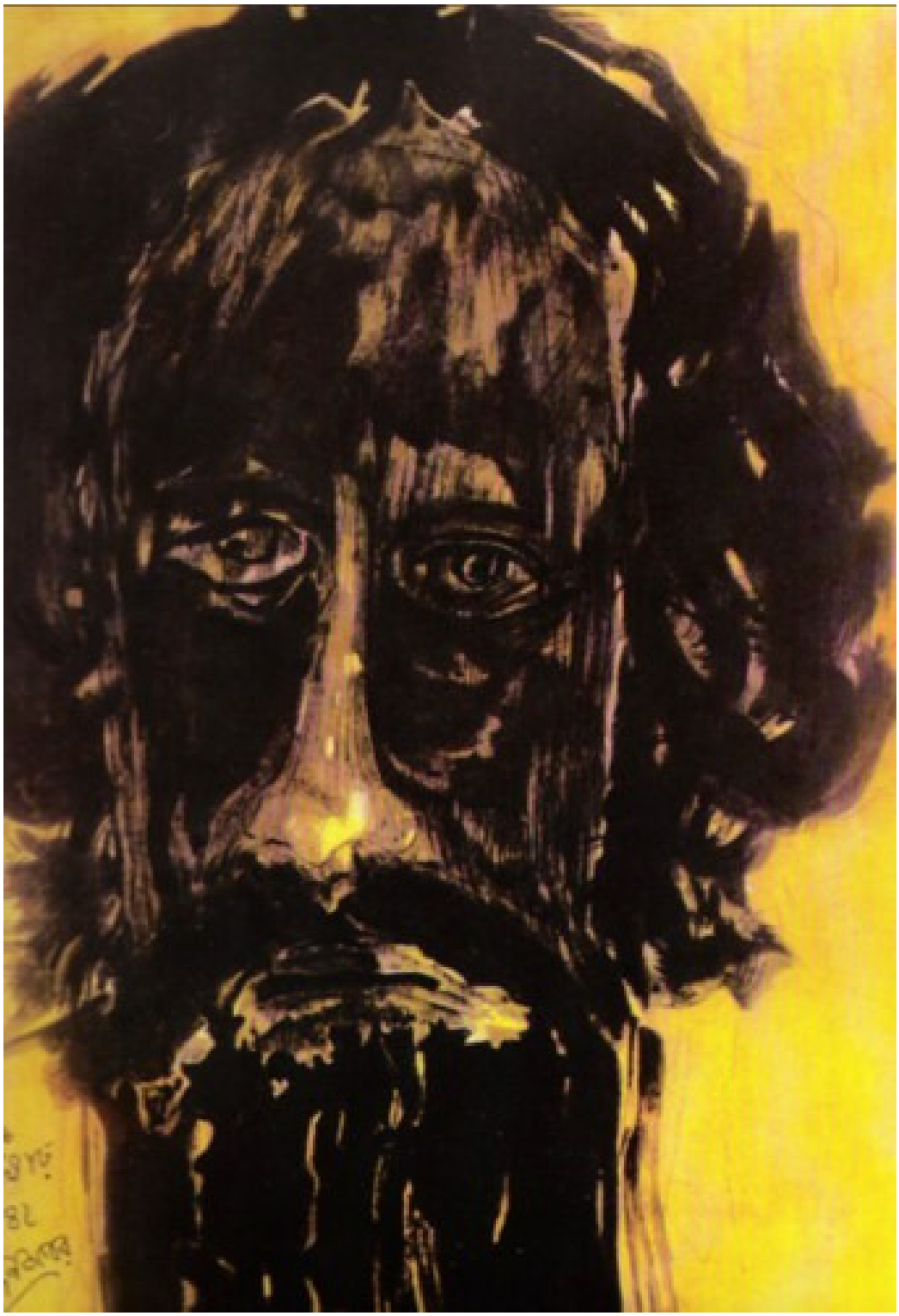

"আত্মপ্রতিকৃতি"
১৯৩৫
মাধ্যম: জলরং

"নামহীন"

১৯৩৫

মাধ্যম: জলরং

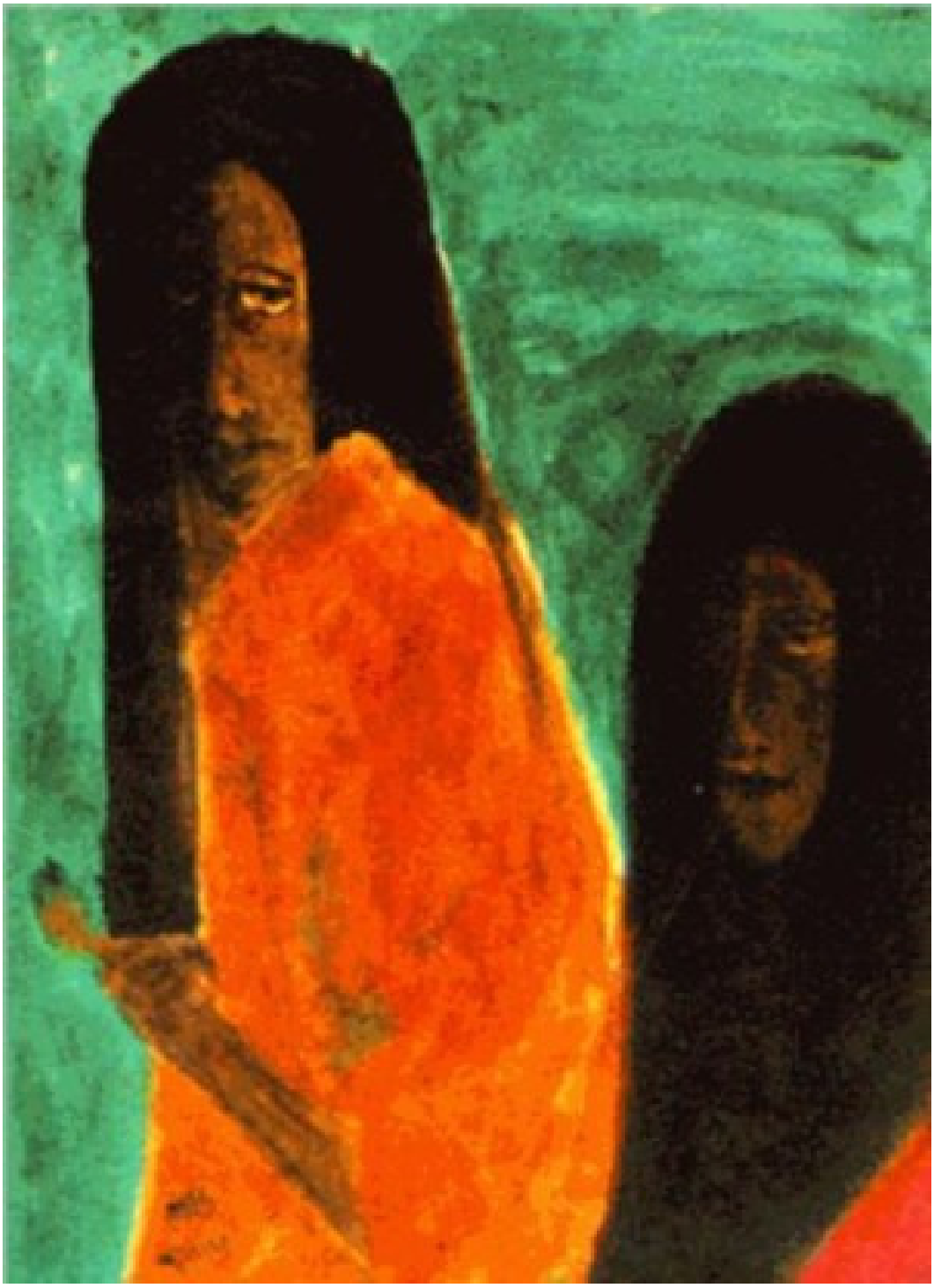

"নামহীন"

১৯৩৫

মাধ্যম: জলরং

"আত্মপ্রতিকৃতি"
১৯৩২
মাধ্যম: জলরং

"নামহীন"

১৯৩৫

মাধ্যম: জলরং

"নামহীন"

১৯৩৮

মাধ্যম: জলরং

"নামহীন"
১৯২৪
মাধ্যম: জলরং

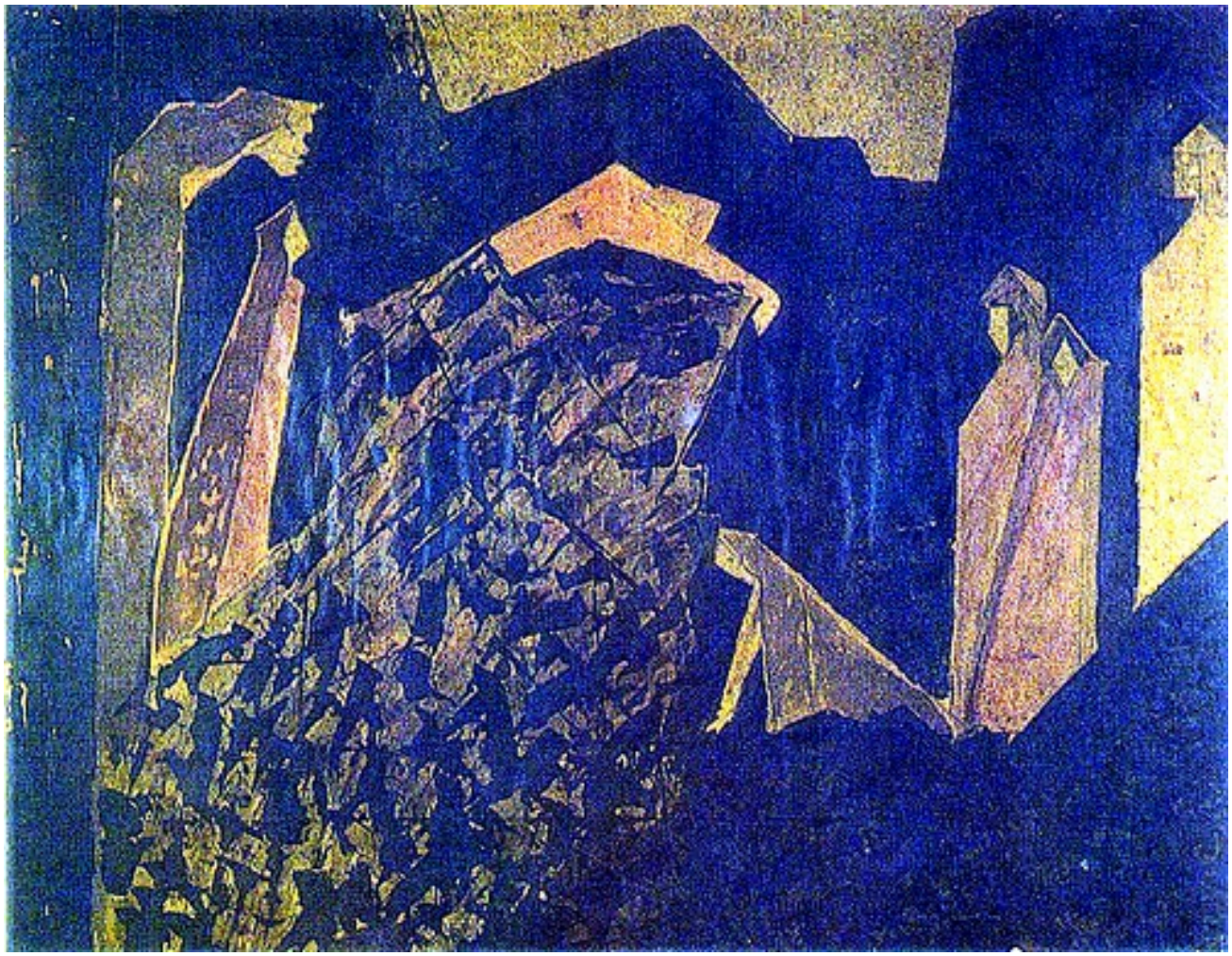

"নামহীন"
১৯৩৭
মাধ্যম: মিশ্র মাধ্যম

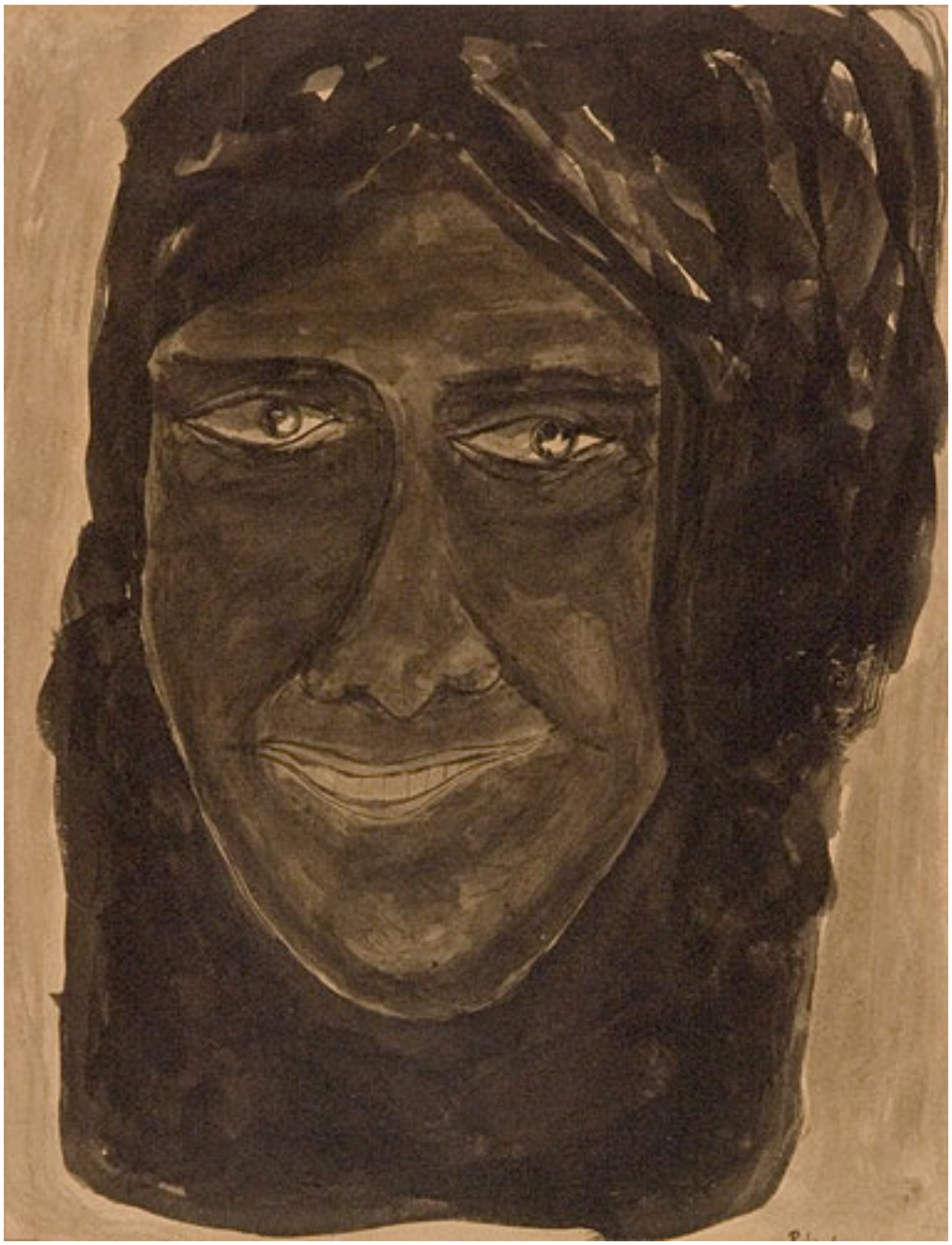

"নামহীন"
১৯৩৩
মাধ্যম: ক্রেয়ন

"নামহীন"
১৯৩৩
মাধ্যম: জলরং

"নর্তকী-০"

১৯২৮

মাধ্যম: কালিকলম

১৯২৮

মাধ্যম: জলরং

"নামহীন"

১৯৩২

মাধ্যম: জলরং

"নামহীন"

১৯২৮

মাধ্যম: জলরং

"নামহীন"

১৯৪১

মাধ্যম: জলরং

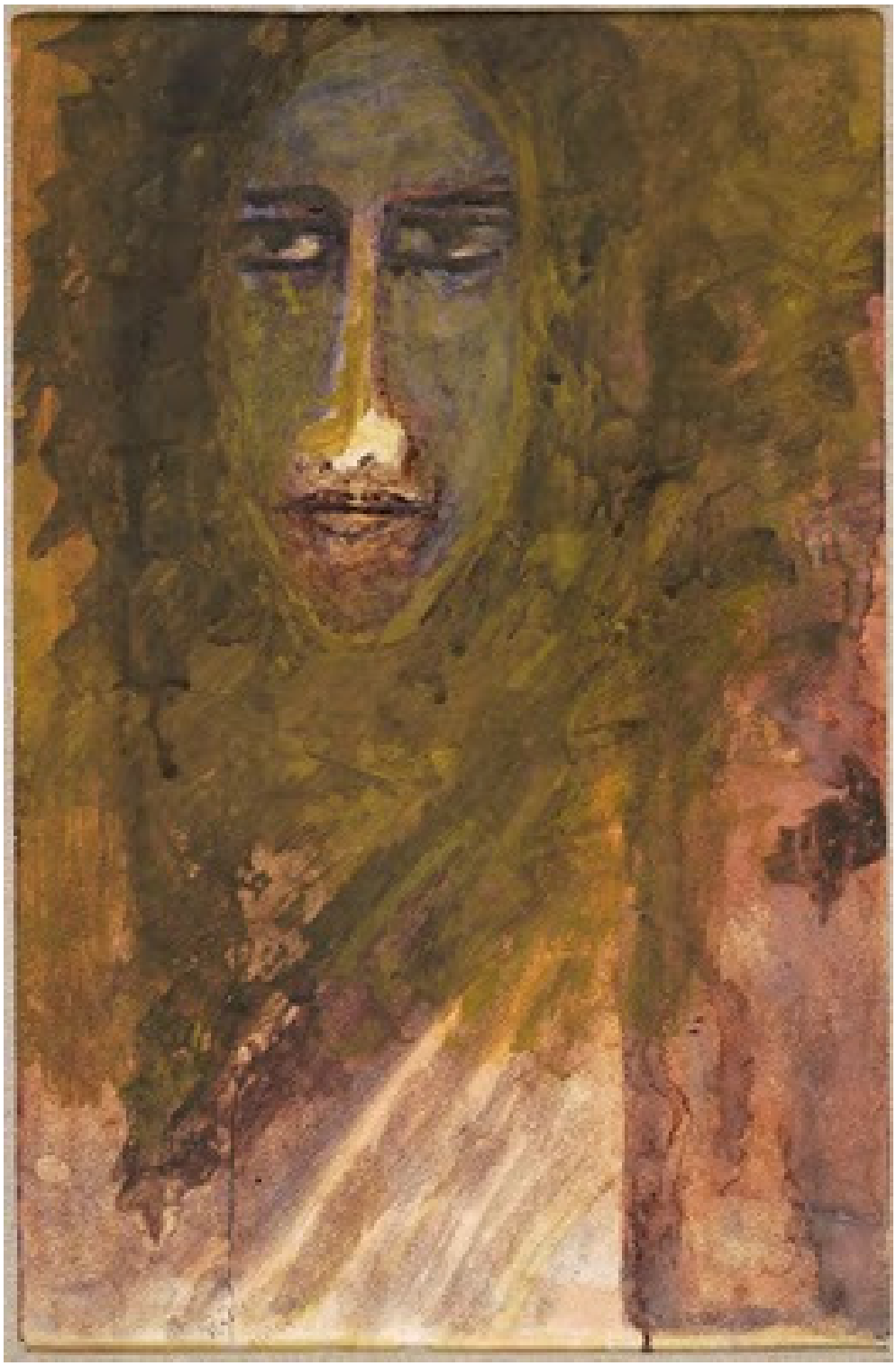

"নামহীন"

১৯৩০

মাধ্যম: জলরং

কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা

প্রলাপ

কতবার সখি! নয়নের জল
করেছি বর্ষণ চরণতলে!
প্রতিশোধ তুই দিস্ নিকো তার
শুধু এক ফোঁটা নয়নজলে!
শুধা ওলো বালা! নিশার আঁধারে
শুধা ওলো সখি! আমার রেতে
আঁখিজল কত করেছে গোপন
মর্ত্য পৃথিবীর নয়ন হতে!
শুধা ওলো বালা নিশার বাতাসে
লুটিতে আসিয়া ফুলের বাস
হৃদয়ে বহন করেছে কিনা সে--
নিরাশ প্রেমীর মরম শ্বাস!
সাক্ষী আছ ওগো তারকা চন্দ্রমা!
কেঁদেছি যখন মরম শোকে--
হেসেছে পৃথিবী, হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিয়া হেসেছে লোকে!
সহেছি সে-সব তোর তরে সখি!
মরমে মরমে জ্বলন্ত জ্বালা !
তুচ্ছ করিবারে পৃথিবী জগতে
তোমারি তরে লো শিখেছি বালা!
মানুষের হাসি তীব্র বিষমাখা
হৃদয় শোণিত করেছে ক্ষয়!
তোমারি তরে লো সহেছি সে-সব
ঘৃণা উপহাস করেছি জয়!

কিনিতে হৃদয় দিয়েছি হৃদয়
নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরে;
অশ্রু মাগিবারে দিয়া অশ্রুজল
উপেক্ষিত হয়ে এয়েছি ফিরে।
কিছুই চাহি নি পৃথিবীর কাছে-
প্রেম চেয়েছিনু ব্যাকুল মনে।
সে বাসনা যবে হল না পূরণ
চলিয়া যাইব বিজন বনে!
তোর কাছে বালা এই শেষবার
ফেলিল সলিল ব্যাকুল হিয়া
ভিখারি হইয়া যাইব লো চলে
প্রেমের আশায় বিদায় দিয়া !
সেদিন যখন ধন, যশ, মান,
অরির চরণে দিলাম ঢালি

সেইদিন আমি ভেবেছিনু মনে
উদাস হইয়া যাইব চলি।
তখনো হায় রে একটি বাঁধনে
আবদ্ধ আছিল পরাণ দেহ।
সে দৃঢ় বাঁধন ভেবেছিনু মনে
পারিবে না আহা ছিঁড়িতে কেহ!

আজ ছিঁড়িয়াছে, আজ ভাঙিয়াছে,
আজ সে স্বপন গিয়াছে চলি।
প্রেম ব্রত আজ করি উদ্‌যাপন
ভিখারি হইয়া যাইব চলি!
পাষাণের পটে ও মূরতিখানি
আঁকিয়া হৃদয়ে রেখেছি তুলি
গরবিনি! তোর ওই মুখখানি
এ জনমে আর যাব না ভুলি!
মুছিতে নারিব এ জনমে আর
নয়ন হইতে নয়নবারি
যতকাল ওই ছবিখানি তোর
হৃদয়ে রহিবে হৃদয় ভরি।
কী করিব বালা মরণের জলে
ওই ছবিখানি মুছিতে হবে!
পৃথিবীর লীলা ফুরাইবে আজ,
আজিকে ছাড়িয়া যাইব ভবে!
এ ভাঙা হৃদয় কত সবে আর!
জীর্ণ প্রাণ কত সহিবে জ্বালা!
মরণের জল ঢালিয়া অনলে
হৃদয় পরাণ জুড়াল বালা!
তোরে সখি এত বাসিতাম ভালো
খুলিয়া দেছিনু হৃদয়তল
সে-সব ভাবিয়া ফেলিবি না বালা

শুধু এক ফোঁটা নয়ন জল?
আকাশ হইতে দেখি যদি বালা
নিঠুর ললনে! আমার তরে
এক ফোঁটা আহা নয়নের জল
ফেলিস্ কখনো বিষাদভরে!
সেই নেত্রজলে-- এক বিন্দু জলে
নিভায়ে ফেলিব হৃদয় জ্বালা!
প্রদোষে বসিয়া প্রদোষ তারায়
প্রেম গান সুখে করিব বালা!

বৈশাখ, ১২৮৩

দিল্লি দরবার

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর,অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির-রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে, আর্য-কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি - কোথাকার এক শূন্যে মরুভূমি -
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি,ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই-সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান,কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ-আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগে নি, তখনো একত্রে ভারত মেলে নি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে--
বন্ধনশৃঙ্খলে করিতে পূজা!
ব্রিটিশ-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ-চরণে লোটাতে শির--
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!
হা রে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ-রাজের বিজয়রবে?
ব্রিটিশ-বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,

এসো গো আমরা যে ক'জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

ভারতী

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন?
অযতনে, আহা, সাধের বীণাটি
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে, আহা, এলোথেলো চুল
এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেন গো আজিকে এ-ভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রানী--
মলিন মলিন বসন ভূষণ
মলিন বদনে নাহিকো বাণী।
তবে কি জননি অমৃতভাষিণি
তোমার ও বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে?
দেখো তবে মাতা দেখো গো চাহিয়া
তোমার ভারত শ্মশান-পারা,
ঘুমায়ে দেখিছে সুখের স্বপন
নরনারী সব চেতনহারা।
যাহা-কিছু ছিল সকলি গিয়াছে,
সে-দিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব,

ভীর আঁধার যে-দিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতি জননী,
তোমারো কি বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও-বীণা আর না বাজিবে তবে?
না না গো, ভারতী, নিবেদি চরণে
কোলে তুলে লও মোহিনী বীণা।
বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
দেখিব ভারত জাগিবে কি না।
অযুত অযুত ভারতনিবাসী
কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে,
সে রোদনধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া
উঠিবে, জননি, দেবতালোকে।
তা যদি না হয় তা হলে, ভারতি,
তুলিয়া লও বিজয়ভেরী,
বাজাও জলদগভীর গরজে
অসীম আকাশ ধ্বনিত করি।
গাও গো হুতাশ-পূরিত গান,
জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ,
উথলি উঠুক ভারত-জলধি--

কাঁপিয়া উঠুক অচলা ধরা।
দেখিব তখন প্রতিভাহীনা
এ ভারতভূমি জাগিবে কি না,
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শয়ান
শরমে হইয়া মরমে-মরা!
এই ভারতের আসনে বসিয়া
তুমিই ভারতী গেয়েছ গান,
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
তোমারি বীণার মোহন তান।
আজও তুমি, মাতা, বীণাটি লইয়া
মরম বিঁধিয়া গাও গো গান--
হীনবল সেও হইবে সবল,
মৃতদেহ সেও পাইবে প্রাণ।

ভারতী,
শ্রাবণ, ১২৮৪

হিমালয়

যেখানে জ্বলিছে সূর্য, উঠিছে সহস্র তারা,
প্রজ্বলিত ধূমকেতু বেড়াইছে ছুটিয়া।
অসংখ্য জগৎযন্ত্র, ঘুরিছে নিয়মচক্রে
অসংখ্য উজ্জ্বল গ্রহ রহিয়াছে ফুটিয়া।
গম্ভীর অচল তুমি, দাঁড়ায়ে দিগন্ত ব্যাপি,
সেই আকাশের মাঝে শুভ্র শির তুলিয়া।
নির্ঝর ছুটিছে বক্ষে, জলদ ভ্রমিছে শৃঙ্গে,
চরণে লুটিছে নদী শিলারাশি ঠেলিয়া।
তোমার বিশাল ক্রোড়ে লভিতে বিশ্রাম-সুখ
ক্ষুদ্র নর আমি এই আসিয়াছি ছুটিয়া।
পৃথিবীর কোলাহল, পারি না সহিতে আর ,
পৃথিবীর সুখ দুখ গেছে সব মিটিয়া ।
সারাদিন, সারারাত, সমুচ্চ শিখরে বসি,
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহময় শূন্যপানে চাহিয়া।
জীবনের সন্ধ্যাকাল কাটাইব ধীরে ধীরে,
নিরালয় মরমের গানগুলি গাহিয়া।
গভীর নীরব গিরি, জোছনা ঢালিবে চন্দ্র,
দূরশৈলমালাগুলি চিত্রসম শোভিবে।
ধীরে ধীরে ঝুরু ঝুরু, কাঁপিবেক গাছপালা
একে একে ছোটো ছোটো তারাগুলি নিভিবে।
তখন বিজনে বসি, নীরবে নয়ন মুদি,
স্মৃতির বিষণ্ণ ছবি আঁকিব এ মানসে।
শুনিব সুদূর শৈলে, একতানে নির্ঝারিণী,
ঝর ঝর ঝর ঝর মৃদুধ্বনি বরষে।
ক্রমে ক্রমে আসিবেক জীবনের শেষ দিন,
তুষার শয্যার ' পরে রহিব গো শুইয়া।
মর মর মর মর দুলিবে গাছের পাতা
মাথার উপরে হুহু -- বায়ু যাবে বহিয়া।

চোখের সামনে ক্রমে , নিভিবে রবির আলো
বনগিরি নির্ঝরিণী অন্ধকারে মিশিবে।
তটিনীর মৃদুধ্বনি, নিঝরের ঝর ঝর
ক্রমে মৃদুতর হয়ে কানে গিয়া পশিবে।
এতকাল যার বুকে, কাটিয়া গিয়াছে দিন,
দেখিতে সে ধরাতল শেষ বার চাহিব।
সারাদিন কেঁদে কেঁদে -- ক্লান্ত শিশুটির মতো
অনন্তের কোলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িব।
সে ঘুম ভাঙিবে যবে, নূতন জীবন ল'য়ে,
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব।
যত কিছু পৃথিবীর দুখ,জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে বিস্মৃতি-জলে মুছে সব ফেলিব।
ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য
নীরবে পৃথিবী-পানে রহিয়াছে চাহিয়া।
ওই জগতের মাঝে, দাঁড়াইব এক দিন,
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া।
রবি শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত
আঁধার আকাশ ঘেরি নিঃশবদে ছুটিছে।
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, মহাস্তব্ধ প্রকৃতির
অভ্যন্তর হতে এক গীতধ্বনি উঠিছে।
গভীর আনন্দ-ভরে, বিস্ফারিত হবে মন
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া।
তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত-মাঝে
ভুঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃপ্রাণ ভরিয়া।

ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৪

আগমনী

সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া
ফুটিল প্রভাততারা।
হেথা হোথা হতে পাখিরা গাহিল
ঢালিয়া সুধার ধারা।
মৃদুল প্রভাতসমীর পরশে
কমল নয়ন খুলিল হরষে,
হিমালয় শিরে অমল আভায়
শোভিল ধবল তুষারজটা।
খুলি গেল ধীরে পূরবদ্বার,
ঝরিল কনককিরণধার,
শিখরে শিখরে জ্বলিয়া উঠিল,
রবির বিমল কিরণছটা।
গিরিগ্রাম আজি কিসের তরে,
উঠেছে নাচিয়া হরষভরে,
অচল গিরিও হয়েছে যেমন
অধীর পাগল-পারা।
তটিনী চলেছে নাচিয়া ছুটিয়া,
কলরব উঠে আকাশে ফুটিয়া ,
ঝর ঝর ঝর করিয়া ধ্বনি
ঝরিছে নিঝরধারা।
তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া মালা,
চলিয়াছে গিরিবাসিনী বালা,

অধর ভরিয়া সুখের হাসিতে
মাতিয়া সুখের গানে।
মুখে একটিও নাহিকো বাণী
শবদচকিতা মেনকারানী
তৃষিত নয়নে আকুল হৃদয়ে,
চাহিয়া পথের পানে।
আজ মেনকার আদরিণী উমা
আসিবে বরষ-পরে।
তাইতে আজিকে হরষের ধ্বনি
উঠিয়াছে ঘরে ঘরে।
অধীর হৃদয়ে রানী আসে যায়,
কভু বা প্রাসাদশিখরে দাঁড়ায়,
কভু বসে ওঠে, বাহিরেতে ছোটে
এখনো উমা মা এলনা কেন?
হাসি হাসি মুখে পুরবাসীগণে
অধীরে হাসিয়া ভূধরভবনে,
"কই উমা কই' বলে "উমা কই',
তিলেক বেয়াজ সহে না যেন!
বরষের পরে আসিবেন উমা
রানীর নয়নতারা ,
ছেলেবেলাকার সহচরী যত
হরষে পাগল-পারা।

ভাবিছে সকলে আজিকে উমায়
দেখিবে নয়ন ভ'রে,
আজিকে আবার সাজাব তাহায়
বালিকা উমাটি ক'রে।
তেমনি মৃণালবলয়-যুগলে,
তেমনি চিকন-চিকন বাকলে,
তেমনি করিয়া পরাব গলায়
বনফুল তুলি গাঁথিয়া মালা।
তেমনি করিয়া পরায়ে বেশ
তেমনি করিয়া এলায়ে কেশ,
জননীর কাছে বলিব গিয়ে
"এই নে মা তোর তাপসী বালা'।
লাজ-হাসি-মাখা মেয়ের মুখ
হেরি উথলিবে মায়ের সুখ,
হরষে জননী নয়নের জলে
চুমিবে উমার সে মুখখানি।
হরষে ভূধর অধীর-পারা
হরষে ছুটিবে তটিনীধারা,
হরষে নিঝর উঠিবে উছসি,
উঠিবে উছসি মেনকারানী।
কোথা তবে তোরা পুরবাসী মেয়ে
যেথা যে আছিস আয় তোরা ধেয়ে
বনে বনে বনে ফিরিবি বালা,
তুলিবি কুসুম, গাঁথিবি মালা,
পরাবি উমার বিনোদ গলে।

তারকা-খচিত গগন-মাঝে
শারদ চাঁদিমা যেমন সাজে
তেমনি শারদা অবনী শশী
শোভিবে কেমন অবনীতলে!
ওই বুঝি উমা, ওই বুঝি আসে,
দেখো চেয়ে গিরিরানী!
আলুলিত কেশ, এলোথেলো বেশ,
হাসি-হাসি মুখখানি।
বালিকারা সব আসিল ছুটিয়া
দাঁড়াল উমারে ঘিরি।
শিথিল চিকুরে অমল মালিকা
পরাইয়া দিল ধীরি।
হাসিয়া হাসিয়া কহিল সবাই
উমার চিবুক ধ'রে,
"বলি গো স্বজনী, বিদেশে বিজনে
আছিলি কেমন করে?
আমরা তো সখি সারাটি বরষ
রহিয়াছি পথ চেয়ে --
কবে আসিবেক আমাদের সেই
মেনকারানীর মেয়ে!
এই নে, সজনী, ফুলের ভূষণ
এই নে, মৃণাল বালা,
হাসিমুখখানি কেমন সাজিবে
পরিলে কুসুম-মালা।'
কেহ বা কহিল,"এবার স্বজনি,

দিব না তোমায় ছেড়ে
ভিখারি ভবের সরবস ধন
আমরা লইব কেড়ে।
বলো তো স্বজনী, এ কেমন ধারা
এয়েছ বরষ-পরে,
কেমনে নিদিয়া রহিবে কেবল
তিনটি দিনের তরে।'
কেহ বা কহিল,"বলো দেখি,সখী,
মনে পড়ে ছেলেবেলা?
সকলে মিলিয়া এ গিরিভবনে
কত-না করেছি খেলা!
সেই মনে পড়ে যেদিন স্বজনী
গেলে তপোবন-মাঝে--
নয়নের জলে আমরা সকলে
সাজানু তাপসী-সাজে।
কোমল শরীরে বাকল পরিয়া
এলায়ে নিবিড় কেশ
লভিবারে পতি মনের মতন
কত-না সহিলে ক্লেশ।
ছেলেবেলাকার সখীদের সব
এখনো তো মনে আছে,
ভয় হয় বড়ো পতির সোহাগে
ভুলিস তাদের পাছে!'
কত কী কহিয়া হরষে বিষাদে
চলিল আলয়-মুখে,

কাঁদিয়া বালিকা পড়িল ঝাঁপায়ে
আকুল মায়ের বুকে।
হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রানী,
চুমিয়া উমার অধরখানি,
"আয় মা জননি আয় মা কোলে,
আজ বরষের পরে।
দুখিনী মাতার নয়নের জল
তুই যদি, মা গো, না মুছাবি বল্
তবে উমা আর ,কে আছে আমার
এ শূন্য আঁধার ঘরে?
সারাটি বরষ যে দুখে গিয়াছে
কী হবে শুনে সে ব্যথা,
বল্ দেখি, উমা, পতির ঘরের
সকল কুশল-কথা।'
এত বলি রানী হরষে আদরে
উমারে কোলেতে লয়ে,
হরষের ধারা বরষি নয়নে
পশিল গিরি-আলয়ে।
আজিকে গিরির প্রাসাদে কুটিরে
উঠিল হরষ-ধ্বনি,
কত দিন পরে মেনকা-মহিষী
পেয়েছে নয়নমণি!

ভারতী, আশ্বিন, ১২৮৪

প্রলাপ ১

১

গিরির উরসে নবীন নিঝর,
ছুটে ছুটে অই হতেছে সারা।
তলে তলে তলে নেচে নেচে চলে,
পাগল তটিনী পাগলপারা।

২

হৃদি প্রাণ খুলে ফুলে ফুলে ফুলে,
মলয় কত কী করিছে গান।
হেতা হোতা ছুটি ফুল-বাস লুটি,
হেসে হেসে হেসে আকুল প্রাণ।

৩

কামিনী পাপড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি,
উড়িয়ে উড়িয়ে ছিঁড়িয়ে ফেলে।
চুপি চুপি গিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়ে,
জাগায়ে তুলিছে তটিনীজলে।

৪

ফিরে ফিরে ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে,
হরষে মাতিয়া, খুলিয়া বুক।
নলিনীর কোলে পড়ে ঢ'লে ঢ'লে,
নলিনী সলিলে লুকায় মুখ।

৫

হাসিয়া হাসিয়া কুসুমে আসিয়া,
ঠেলিয়া উড়ায় মধুপ দলে।
গুন্ গুন্ গুন্ রাগিয়া আগুন,
অভিশাপ দিয়া কত কী বলে।

৬

তপন কিরণ -- সোনার ছটায়,
লুটায় খেলায় নদীর কোলে।
ভাসি ভাসি ভাসি স্বর্ণ ফুলরাশি
হাসি হাসি হাসি সলিলে দোলে।

৭

প্রজাপতিগুলি পাখা দুটি তুলি
উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায় দলে।
প্রসারিয়া ডানা করিতেছে মানা
কিরণে পশিতে কুসুমদলে।

৮

মাতিয়াছে গানে সুললিত তানে
পাপিয়া ছড়ায় সুধার ধার।
দিকে দিকে ছুটে বন জাগি উঠে
কোকিল উতর দিতেছে তার।

৯

তুই কে লো বালা! বন করি আলা,
পাপিয়ার সাথে মিশায়ে তান!
হৃদয়ে হৃদয়ে লহরী তুলিয়া,
অমৃত ললিত করিস্ গান।

১০

স্বর্গ ছায় গানে বিমানে বিমানে
ছুটিয়া বেড়ায় মধুর তান।
মধুর নিশায় ছাইয়া পরান,
হৃদয় ছাপিয়া উঠেছে গান।

১১

নীরব প্রকৃতি নীরব ধরা।
নীরবে তটিনী বহিয়া যায়।
তরুণী ছড়ায় অমৃতধারা,
ভূধর, কানন, জগত ছায়।

১২

মাতাল করিয়া হৃদয় প্রাণ,
মাতাল করিয়া পাতাল ধরা।
হৃদয়ের তল অমৃতে ডুবায়ে,
ছড়ায় তরুণী অমৃতধারা।

১৩

কে লো তুই বালা! বন করি আলা,
ঘুমাইছে বীণা কোলের 'পরে।
জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া স্বরগীয় মায়া,
ঢল ঢল ঢল প্রমোদ-ভরে।

১৪

বিভোর নয়নে বিভোর পরানে --
চারি দিক্ পানে চাহিস্ হেসে!
হাসি উঠে দিক্! ডাকি উঠে পিক্!
নদী ঢলে পড়ে পুলিন দেশে!!

১৫

চারি দিক্ চেয়ে কে লো তুই মেয়ে,
হাসি রাশি রাশি ছড়িয়ে দিস্?
আঁধার ছুটিয়া জোছনা ফুটিয়া
কিরণে উজলি উঠিছে দিশ্!

১৬

কমলে কমলে এ ফুলে ও ফুলে,
ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াস্ বালা!
ছুটে ছুটে ছুটে খেলায় যেমন
মেঘে মেঘে মেঘে দামিনী-মালা।

১৭

নয়নে করুণা অধরে হাসি,
উছলি উছলি পড়িছে ছাপি।
মাথায় গলায় কুসুমরাশি
বাম করতলে কপোল চাপি।

১৮

এতকাল তোরে দেখিনু সেবিনু --
হৃদয়-আসনে দেবতা বলি।
নয়নে নয়নে, পরানে পরানে,
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিনু তুলি।

১৯

তবুও তবুও পূরিল না আশ,
তবুও হৃদয় রহেছে খালি।
তোরে প্রাণ মন করিয়া অর্পণ
ভিখারি হইয়া যাইব চলি।

২০

আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা,
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।

২১

দেখিব ঊষার পূরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
তুষার-দর্পণে দেখিছে আনন
সাঁজের লোহিত জলদ-ঘটা।

২২

কনক-সোপানে উঠিছে তপন
ধীরে ধীরে ধীরে উদয়াচলে।
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সোনার বরন,
তুষারে শিশিরে নদীর জলে।

২৩

শিলার আসনে দেখিব বসিয়ে,
প্রদোষে যখন দেবের বালা
পাহাড়ে লুকায়ে সোনার গোলা
আঁখি মেলি মেলি করিবে খেলা।

২৪

ঝর ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
চপল নিঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া -- নাচিয়া -- বহিয়া যায়।

২৫

বসিব দুজনে -- গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয়ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগত শুনিবে সে-সব কথা।

২৬

যেথায় যাইবি তুই কলপনা,
আমিও সেথায় যাইব চলি।
শ্মশানে, শ্মশানে -- মরু বালুকায়,
মরীচিকা যথা বেড়ায় ছলি।

২৭

আয় কলপনা আয় লো দুজনা,
আকাশে আকাশে বেড়াই ছুটি।
বাতাসে বাতাসে আকাশে আকাশে
নবীন সুনীল নীরদে উঠি।

২৮

বাজাইব বীণা আকাশ ভরিয়া,
প্রমোদের গান হরষে গাহি,
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
অবাক জগত রহিবে চাহি!

২৯

জলধররাশি উঠিবে কাঁপিয়া,
নব নীলিমায় আকাশ ছেয়ে।
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
দেবতারা সব রহিবে চেয়ে।

৩০

সুর-সুরধুনী আলোকময়ী,
উজলি কনক বালুকারাশি।
আলোকে আলোকে লহরী তুলিয়া,
বহিয়া বহিয়া যাইছে হাসি।

৩১
প্রদোষ তারায় বসিয়া বসিয়া,
দেখিব তাহার লহরীলীলা।
সোনার বালুকা করি রাশ রাশ,
সুর-বালিকারা করিবে খেলা।

৩২
আকাশ হইতে দেখিব পৃথিবী!
অসীম গগনে কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৩
কোথায় ভূধর কোথায় শিখর
অসীম সাগর কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু,
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৪
আয় কল্পনা আয় লো দুজনা,
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি।
পৃথিবী ফিরিয়া জগত ফিরিয়া,
হরষে পুলকে দিবস রাতি।

অগ্রহায়ণ, ১২৮২

৩৫

আয় কল্পনা আয় লো দুজনা,
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি।
পৃথিবী ফিরিয়া জগত ফিরিয়া,
হরষে পুলকে দিবস রাতি।

অগ্রহায়ণ, ১২৮২

নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবন (১৯৩২-১৯৪১) কবির দীর্ঘ অসুস্থতার সময়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় মূলত মৃত্যুর প্রকৃতি অনুধাবনে মনোনিবেশ করেছেন।

১৯৩২-৩৭ সময়কালের রচনাবলি

১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত রবীন্দ্রনাথের (বামে) সাক্ষাৎ। বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করে মানবজাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির হীনতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের মত সুদৃঢ় হয়। ১৯৩২ সালের মে মাসে তিনি ইরাকের একটি বেদুইন শিবিরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক উপজাতীয় নেতা তাঁকে বলেন, "আমাদের মহানবী বলেছেন, তিনিই সত্যকারের মুসলমান, যাঁর বাক্য বা কর্মের দ্বারা তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম মানুষগুলির ন্যূনতম ক্ষতিসাধনও হয় না।" কবি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, "চমকে উঠলুম। বুঝলুম তার কথাগুলিই মানবতার মূল কথা।”

১৯৩৭-৪১ সময়কালের অসুস্থতা

ঋজু শালপ্রাংশু দেহের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন সুস্বাস্থ্য ভোগ করলেও জীবনের শেষ চার বছর দীর্ঘস্থায়ী পীড়ায় কষ্ট পেয়েছিলেন।

তাঁর মূল সমস্যা ছিল অর্শ। এই চার বছরে দুবার দীর্ঘসময় অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকতে হয় তাঁকে। ১৯৩৭ সালে একবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন কবি; এই সময় কোমায় চলে গিয়ে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেন অত্যন্ত কাছ থেকে। আর তখন থেকেই তাঁর এই দীর্ঘকালীন অসুস্থতার সূত্রপাত। ১৯৪০ সালের শেষ দিকে আবার একই ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এবার আর সেরে ওঠেননি। এই সময়কালের মধ্যেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু কবিতা রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ।

এই কবিতাগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যুকে ঘিরে লেখা রবীন্দ্রনাথের কিছু অবিস্মরণীয় পঙক্তিমালা। দীর্ঘ রোগভোগের পর, শল্য চিকিৎসার জটিলতার কারণে, ১৯৪১ সালের ৭ অগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোয় অবস্থিত বাসভবনের প্রয়াত হন রবীন্দ্রনাথ। উল্লেখ্য, জোড়াসাঁকোর এই বাড়িতেই কবির জন্ম ও বেড়ে ওঠা।

আজও বাংলাভাষী জগতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী পরম শ্রদ্ধা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে।

আলো যে
যায় রে দেখা--
হৃদয়ের পুব-গগনে
সোনার রেখা।
এবারে ঘুচল কি ভয়।
এবারে হবে কি জয়।
আকাশে হল কি ক্ষয়
কালির লেখা।
কারে ওই
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায় একা?
ওরে তুই সকল ভুলে
চেয় থাক্ নয়ন তুলে--
নীরবে চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা।

গীতালি
--রবীঠাকুর

"একটি সুন্দর সাহিত্য আকাশের প্রত্যাশায়"

.....আমরা আমাদের মত থাকতে চাই। শুভাশিষ।

-শৈলী টিম

-- একটি শৈলী প্রকাশনা --

শৈলী

ই-জার্নাল প্রজেক্ট

শৈলী.কম -এর একটি প্রয়াস,
মে ২০১১

http://shoily.com

আড্ডা হোক শুদ্ধতায়, শিল্প আর সাহিত্যে।